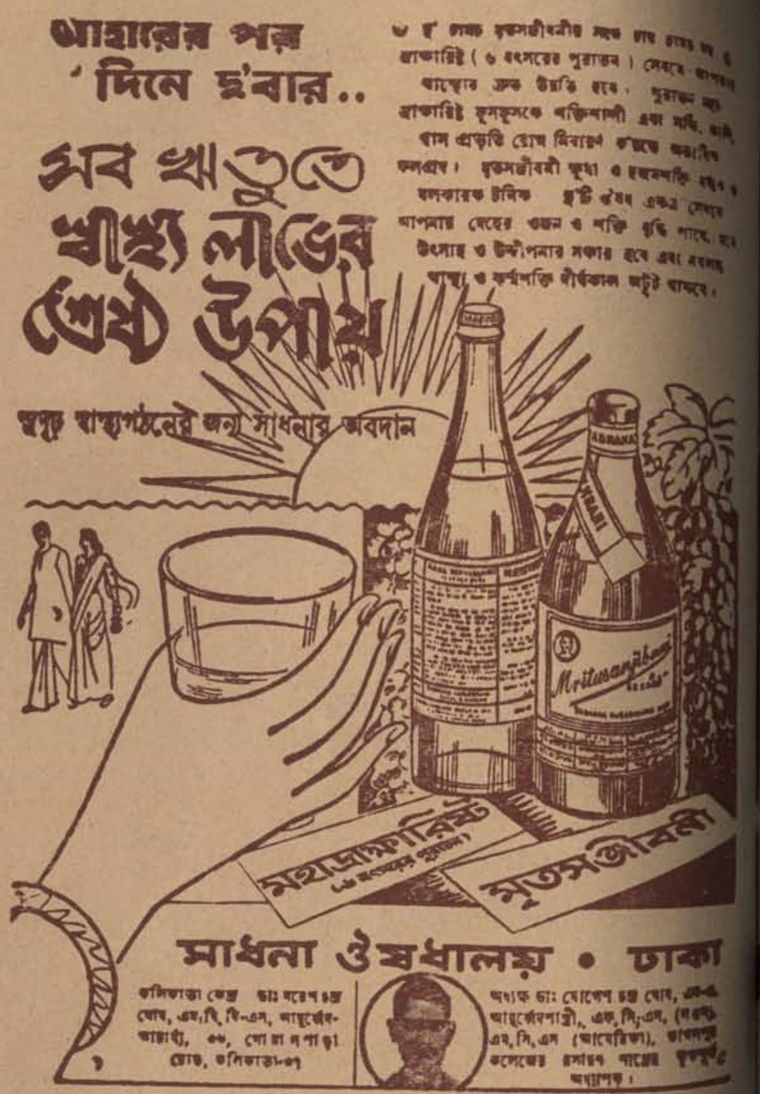
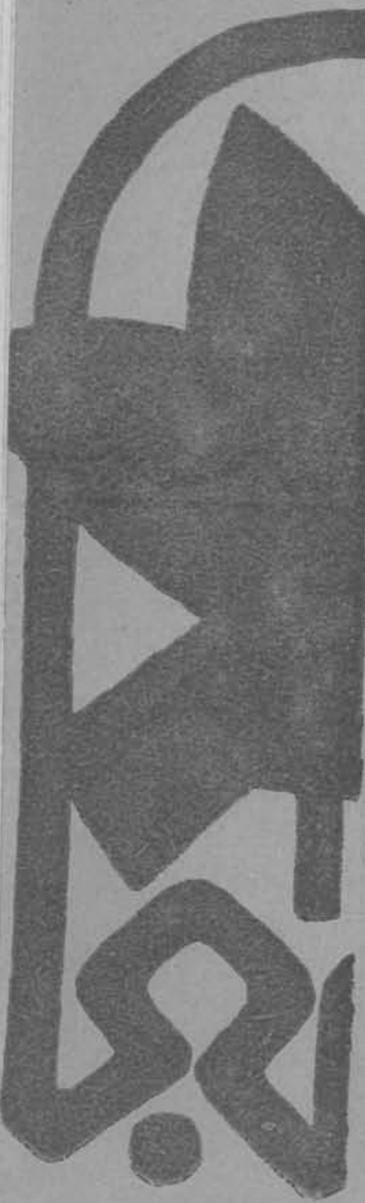

আহারের পর
'দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
সুস্থ স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা


পরিচয়



পরিচয়

শেকসপীয়র সংখ্যা

সম্ভাব্য লেখক-তালিকা

নীরেন্দ্রনাথ রায়
বিষ্ণু দে
অমলেন্দু বসু
অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী
সীতাংশু মৈত্র
হমফ্রে হাউস
রবীন্দ্র রজুমদার
ঋত্বিক ঘটক
রাম বসু
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
উৎপল দত্ত
শঙ্খ ঘোষ
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়
মণীন্দ্র রায়
তরুণ সান্যাল
প্রভৃতি

মহাকবি শেকসপীয়রের চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী বৈশাখ সংখ্যা পরিচয় বর্ধিতাকারে বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে।

বাংলা দেশের বিশিষ্ট সুধী-বৃন্দ এই সংখ্যায় শেক্‌সপীয়রের কবিকর্মের সম্যক পর্যালোচনা করবেন ও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

*

এজেন্টদের কাছে অনুরোধ তারা যেন পূর্বাহ্ণে তাদের চাহিদা জানান

সম্ভাব্য লেখক-তালিকা

রুদ্র সেনগুপ্ত
হিরণকুমার সান্যাল
ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
সরোজ আচার্য
গোপাল হালদার
সুনীল চট্টোপাধ্যায়
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
জগন্নাথ চক্রবর্তী
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
প্রমোদ মুখোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
অন্নদাশঙ্কর রায়
সুধাংশু ঘোষ
প্রভৃতি

দাম : দেড় টাকা

এই সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না। যে কোনো সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকা নিয়মিত পেতে হলে গ্রাহক হওয়াই শ্রেয়।

চাঁদার হার

বার্ষিক : দশ টাকা   ষান্মাসিক : সাড়ে পাঁচ টাকা

পরিচয়

বর্ষ ৩৩। সংখ্যা ৯
চৈত্র, ১৩৭০

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ—কানু বসু

সম্পাদক
গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

ভেদবুদ্ধি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশে অন্ধকার রাত্রি। মানুষের মন চাপা পড়েচে। তাই অবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিতে সমস্ত জাতি পীড়িত। আশ্রয়ের আশায় অল্পমাত্র যা-কিছু গড়ে তুলি তা নিজেরই মাথার উপরে ভেঙে ভেঙে পড়ে। আমাদের শুভচেষ্টাও খণ্ড খণ্ড হয়ে দেশকে আহত করচে। আত্মীয়কে আঘাত করার আত্মঘাত যে কি সর্বনেশে সে কথা বুঝেও বুঝিনে। যে শিক্ষা লাভ করচি ভাগ্যদোষে সেই শিক্ষাই বিকৃত হয়ে আমাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষের অস্ত্র জোগাচ্চে।

এই যে পাপ দেশের বুকের উপর চেপে তার নিঃশ্বাস রোধ করতে প্রবৃত্ত এ পাপ প্রাচীন যুগের, এই অন্ধ বার্ধক্য যাবার সময় হল। তার প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আজ নিদারুণ দুর্যোগ ঘটিয়ে নিজেরই চিতানল জ্বালিয়েচে। এই উপলক্ষ্যে আমরা যতই দুঃখ পাই মেনে নিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমাদের পরম বেদনায় এই পাপ হয়ে যাক নিঃশেষে ভস্মসাৎ। বহু যুগের পুঞ্জীকৃত অপরাধ যখন আপন প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করে তখন তার দুঃখ অতি কঠোর,—এই দুঃখের দ্বারাই অপরাধ আপন বীভৎসতার পরিচয় দিয়ে উদাসীন চিত্তকে জাগিয়ে তোলে। একান্ত মনে কামনা করি এই দুঃসহ পরিচয়ের কাল যেন এখনি শেষ হয়,

দেশ যেন আত্মকৃত অপঘাতে না মরে, বিশ্বজগতের কাছে বার-বার যেন উপহসিত না হই।

আজ অন্ধ অমারাত্রির অবসান হোক তরুণদের নব-জীবনের মধ্যে। আচার-ভেদ, স্বার্থভেদ, মতভেদ, ধর্মভেদের সমস্ত ব্যবধানকে বীরতেজে উত্তীর্ণ হয়ে তারা ভ্রাতৃপ্রেমের আহ্বানে নবযুগের অভ্যর্থনায় সকলে মিলিত হোক। যে দুর্বল সে-ই ক্ষমা করতে পারে না, তারুণ্যের বলিষ্ঠ ঔদার্য সকল প্রকার কলহের দীনতাকে নিরস্ত করে দিক, সকলে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সর্বজনীন কল্যাণকে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করি।

সর্ববঙ্গ মুসলিম ছাত্রসম্মিলনীর প্রতি। প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৮, পৃঃ ১

ভি. বালাবুশেভিচ

ভারতীয় ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা

ভারতবিদ্যা এবং সেই সঙ্গে ভারতের ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও অর্থনীতির কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে সোভিয়েত গবেষকগণ গবেষণামূলক বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন ও করে যাচ্ছেন। সে বিষয়ে ম্যুনিকে বিগত চব্বিশতম ও মস্কোয় পঁচিশতম প্রাচ্যবিদ্যা কংগ্রেসে আলোচনা হয়েছে। নয়া দিল্লিতে এই ছাব্বিশতম কংগ্রেসের আলোচ্যও তাই-ই।

সোভিয়েতে ভারতবিদ্যা-বিষয়ক গবেষণার পরিধি বর্তমানে আরও ব্যপ্ত ও সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এ-কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, বর্তমানে সোভিয়েতে ভারতবিদ্যার গবেষণা ও চর্চার ব্যাপকতা সুপ্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস, অর্থনীতি, ভারতীয় সভ্যতার বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদাবলী সমস্ত কিছুকে জড়িয়েই অগ্রসর হচ্ছে। অতীতের রুশীয় পণ্ডিতসমাজ প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণার এক উজ্জ্বল ধারা রক্ষা করে গেছেন। তবে তাঁদের ভারতবিদ্যার গবেষণা প্রাচীন ভারত সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। বর্তমান সোভিয়েত গবেষকগণ প্রাচীন যুগ সম্পর্কেও যেমন কাজ করছেন, তেমনি সমকালীন ভারত সম্পর্কেও তাঁরা পরম আগ্রহভরে তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণা-পত্র প্রস্তুত করে যাচ্ছেন।

সোভিয়েতে ভারতবিদ্যা-গবেষণার উপর এই নতুন ও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, অবশ্যই, আসে ভারতীয় জনগণের নিরন্তর সংগ্রামে ঔপনিবেশিক শাসনের উচ্ছেদের ফলে। এই সংগ্রামের সাফল্যের ঐতিহাসিক তাৎপর্যই তাতে স্বীকৃত এবং তারপর স্বাধীন সার্বভৌম ভারতে যে পুনর্গঠনের ও রূপান্তরের পর্ব চলেছে, তাও প্রতিফলিত হল।

সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদেরা যে ব্যাপক কাজ করছেন, একটি প্রবন্ধের

সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার সামগ্রিকতা ধরে দেওয়া অসম্ভব। সেহেতু, বর্তমান আলোচনায় কেবলমাত্র ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সমস্যার মধ্যেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব।

মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কৃত পুরাতাত্ত্বিক তথ্যাবলী

সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের নানান স্থানে খননকার্য চালিয়ে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বহু মূল্যবান বিষয়বস্তু সোভিয়েত গবেষকরা উদ্ধার করেছেন।

এই সব আবিষ্কারাদি মধ্য এশীয় ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সূত্রটিকেই পুনঃপ্রকাশিত করেছে। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় তাসখন্দের পুরাতত্ত্ববিদ এল. আলবাউমের জাঙ-তেপে আবিষ্কারের কথা। বার্চ গাছের ছালের উপর ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত অনেকগুলি নথীপত্র এখানে পাওয়া যায়। প্রাথমিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, সেগুলি হল সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ অনুশাসন। সোভিয়েত গবেষকরা এই সব নথীপত্র অধ্যয়ন করে একটি খণ্ড প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সেই সঙ্গে এই সব প্রাপ্ত নথীপত্রাদির অনুলিপি ভারতীয় গবেষকদের নিকটও প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এ কাজ সম্পূর্ণ হলে ভারত ও মধ্য-এশিয়ার মধ্যে সরাসরি সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিষয়ে আরও নতুন আলোকপাত ঘটবে এবং মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রসারের কাল ও ধরন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রকাশ পাবে।

ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠি লিপি লিখিত মৃৎপাত্রাদির আবিষ্কারও বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এগুলি আবিষ্কৃত হয় কারা-তেপে, লেনিনগ্রাদের পুরাতত্ত্ববিদ বি. স্তাভিস্কির উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায়। আবিষ্কৃত বিষয় ও তথ্যসামগ্রীর যথোচিত বিশ্লেষণে মনে হয় এগুলি কুষাণ যুগের নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের ছাত্র ও গবেষকদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেকগুলি স্মারকস্তম্ভ সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ায় সম্প্রতিকালে আবিষ্কৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এস. পি. তলস্তফ কর্তৃক খোয়ারেজম-এ এবং এ. এম. বেলেনিৎস্কী কর্তৃক পিয়ানজিখন্দে আবিষ্কারগুলির কথা।

সোভিয়েত পণ্ডিতদের প্রাচীন ভারত বিষয়ে গবেষণার প্রাসঙ্গিক একটি সমস্যা সম্পর্কে আমি কিছু উল্লেখ করব। বিষয়টি 'আর্য অভিযান' সম্পর্কিত।

এই 'আর্য অভিযান'-এর সমস্যাটি বেশ জটিল। সোভিয়েত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ

জি. এম. বোনগার্দ-লেভিন এ বিষয়ে যে কাজ করেছেন তাতে তিনি সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার গবেষক ও ভারতের গবেষক—উভয় দেশের পণ্ডিতদেরই সংগৃহীত সাম্প্রতিকতম তথ্যাবলী ব্যবহার করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অন্যান্য ভারততত্ত্ববিদ গবেষক এবং ভারতীয় গবেষকদেরও দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। সূত্রাকারে বোনগার্দ-লেভিনের সিদ্ধান্তগুলি এই :

(ক) আর্যরা ভারতে মাত্র একবারে একটি বৃহৎ গোষ্ঠীতে আসে নি, কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধরে আর্য গোষ্ঠীগুলি তরঙ্গের পর তরঙ্গে অভিযান করে ভারতভূমিতে চলে এসেছে ; (খ) খৃষ্ট-পূর্ব ১৫-১৭ শতাব্দীতে হরপ্পা সভ্যতার প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির অবক্ষয় এবং ঋগবেদ-যুগের (বৈদিক আর্য) ইন্দো-আর্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সমার্থক বলে ধরা হয় যে "চিত্রিত ধূসর পাত্রে"র সংস্কৃতির মানুষদের (খৃষ্ট-পূর্ব ১১-১২ শতক), তাদের আগমন কালের মধ্যে রয়ে গেছে বেশ বড় এক সাময়িক বিরতির কাল। (গ) হরপ্পা সভ্যতার ক্ষয়, প্রধানত, তার আভ্যন্তরীণ কারণেই ঘটে এবং তা প্রত্যক্ষভাবে বৈদিক আর্যদের অভিযানের ফলে হয় নি। এই বৈদিক আর্যদের সংস্কৃতি আঞ্চলিক দিক বা অন্য কোনোদিক থেকেই হরপ্পা সভ্যতার প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না।

পুঁজিবাদী সম্পর্কের আবির্ভাবের লক্ষণগুলি

ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের গবেষণায় সোভিয়েত পণ্ডিতরা ১৭-১৮ শতাব্দীতে ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের মান ও সমস্যাদি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে কাজ করেছেন। পরলোকগত অধ্যাপক আই. এম. রেইসনার এবং ভারততত্ত্ববিদ এল. বি. অ্যালায়েফ, ই. এন. কোমারফ, ভি. আই. পাভলফ, এ. আই. চিচেরফ এবং অন্যান্য সোভিয়েত পণ্ডিতগণ প্রমাণিত করেছেন যে মধ্যযুগে ভারতে নিজস্ব বিকাশ কি ধারায় হয়েছিল। মধ্যযুগে ভারতের কোনোরকম প্রগতিশীল বিকাশ ঘটে নি এবং অর্থনৈতিক বদ্ধতা ও রাজনৈতিক নৈরাজ্যই তখনকার ভারতের চিত্র ছিল বলে যে একটা মত চালানো হয়, সোভিয়েত পণ্ডিতরা তা জোরালোভাবে খণ্ডন করেছেন। সোভিয়েত এবং ভারতীয় পণ্ডিতরা দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তৎকালীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক এমন কিছু পরিবর্তন হচ্ছিল, যা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই

ইতিহাসের বিকাশের ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছিল। ১৭-১৮ শতকে তখন মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা, সামন্ততান্ত্রিক অরাজকতাও চলেছে। তৎসত্ত্বেও পণ্য এবং অর্থ-সম্পর্কগুলি বিকাশ পাচ্ছিল; ভূমির রাষ্ট্রীয় সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা পরিবর্তিত হচ্ছিল ব্যক্তিগত সামন্ততান্ত্রিক মালিকানায়। গ্রাম্য সমাজগুলি ক্রমশ তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা হারাচ্ছিল এবং সমাজের উপরের দিকে এক বিত্তশালী স্তর গড়ে উঠছিল। বিরাট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুটির শিল্পগুলির বিকাশ, প্রাথমিক পর্যায়ের উৎপাদন কারখানা প্রভৃতি— এইভাবে পুঁজিবাদী সম্পর্কের উদ্ভব হচ্ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর যে সমস্ত পৃথক পৃথক সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, বিভিন্ন আঞ্চলিক জাতিসত্তাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রক্রিয়াও তার মধ্য দিয়েই চলছিল।

ব্রিটিশের ভারত-বিজয় এবং ১৮ শতকের শেষ পাদ ও ১৯ শতকের প্রথম পাদ জুড়ে তাদের আদিম পুঁজিসংগ্রহের পদ্ধতিতে পরিচালিত অবাধ লুণ্ঠন, ভারতের এই নিজস্ব বিকাশের ধারাকে শুধু যে বিঘ্নিত করল তা নয়, তাকে ব্যাহত ও ছেদযুক্ত করল। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের দ্বারা ভারতের সামাজিক-আর্থনীতিক এই নিজস্ব ধারার বেড়ে-ওঠা সম্পর্কগুলি ভ্রূণাবস্থায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হল এবং সেই সব স্থগিত-থাকা বিকাশ আবার শুরু হতে পারল একেবারে আধুনিক যুগে এসে, ঔপনিবেশিক পরাধীনতার যুগে; অর্থাৎ এমন একটি পরিবেশে যা সামাজিক প্রগতিকে বিকলাঙ্গ করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে রুদ্ধ করে দেয়।

ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জাতীয় শক্তিগুলির বিবর্তন

ভারত-ইতিহাসের আধুনিক পর্ব সম্পর্কে সোভিয়েতের ইতিহাস-গবেষকরা বিশেষ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন ও গবেষণা-নিবন্ধসমূহের মর্মবস্তু হল বৃটিশ ঔপনিবেশিক-ব্যবস্থার শাসনাধীনে ভারতের আর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনের ব্যাহতাবস্থার সমস্যা এবং এই ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় শক্তিগুলির উদ্ভব ও ক্রমবিবর্ধনের বিষয়টি।

সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ অনেক পণ্ডিত ও গবেষকের সহযোগে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় 'সমসাময়িক যুগের ভারত-ইতিহাস' গ্রন্থটি। সোভিয়েত

গবেষকদের প্রাগুক্ত ধ্যান-ধারণার সমন্বিত প্রকাশ ঘটেছে এই গ্রন্থটিতে। এই গ্রন্থে সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রধানভাবে বিবৃত করা হয়েছে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ভারতের জনগণ ও গণ-আন্দোলনের চূড়ান্ত ও মুখ্য ভূমিকাটিকে। এন. এম. গোল্ডবার্গ, এ. এম. ওসিপফ এবং অন্যান্য ভারত-বিশেষজ্ঞরা এই গ্রন্থে তাঁদের লিখিত অধ্যায়গুলিতে সুস্পষ্ট ভাষায় দেখিয়েছেন সামাজিক ও আর্থনীতিক প্রাক-শর্তগুলি তখন কি ছিল, এবং ১৮৫৭-'৫৯ সালের মহাবিদ্রোহ এবং অনুরূপ আরও অসংখ্য স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রায়-স্বতঃস্ফূর্ত জনপ্রিয় আন্দোলনগুলির প্রকৃত জনভিত্তিক প্রকৃতি এবং প্রগতিশীল ভূমিকা (তৎকালীন বাস্তব অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিতের মূল্যায়নে)। এগুলি প্রধানত ছিল কৃষক অভ্যুত্থান এবং বিদেশী শক্তির শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধেই সেগুলির প্রতিরোধ ছিল।

গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে ১৯ শতকের জাতীয় সংস্থাগুলির কার্যাবলী বিষয়ে এবং সেই সূত্রেই পরবর্তী যুগে ২০ শতকের প্রথম পাদে যে সংগঠিত গণ-আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গেল তার পটভূমি ও সামাজিক-আর্থনীতিক বিশ্লেষণও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই অধ্যায়ের রচয়িতা হলেন ই. এম. কোমারফ ও এ. আই. লেভ্‌কোফস্কি। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, ১৯০৫-'০৮ সালে ভারতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উত্থান ঔপনিবেশিক-ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য ভারতীয় জনগণের সচেতন প্রয়াসেরই প্রতিফলন।

১৯০৫-'০৮ সালের মধ্যে ভারতে অনেকগুলি আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এইসব আন্দোলন ও পরবর্তী বছরগুলির আন্দোলনসমূহ স্পষ্টতই সে সময়ের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের গণ-চরিত্রকেই উদ্ঘাটিত করে তোলে। ঘটনাবলীর সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত এই তথ্য ও সত্য ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা অবশ্য অস্বীকার করেন। এই সব ঐতিহাসিকরা যথেষ্ট প্রয়াস করে দেখাতে চান যে, ওই আন্দোলনগুলি হল "মাত্র মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর" কার্যকলাপ, যার পিছনে কোনও জনসমর্থন বা ভিত্তি ছিল না। সোভিয়েত ঐতিহাসিক ও গবেষকরা নথী-তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে ১৯০৫-'০৮ সালের জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে শিল্প-শ্রমিকরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। সেই যুগের সংগ্রামে অংশগ্রহণই পরবর্তী যুগে শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয় আন্দোলনের সামনাসামনি আসার পথ খুলে দেয়।

ভারত-রুশ সম্পর্ক

সোভিয়েত ভারতবিদ্যা গবেষণার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভারত-রুশ সম্পর্ক। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারত-রুশ সম্পর্ক সংক্রান্ত মহাফেজখানার দলিলের একটি সংকলন সেই সুদূর অতীতে ভারত-রুশ সম্পর্কের কয়েকটি বিশিষ্ট দিকের উপর নতুন আলোকপাত করে। অষ্টাদশ শতাব্দী সম্পর্কে অনুরূপ দলিলের আর একটি সংকলন বর্তমানে ছাপা হচ্ছে।

এই সিরিজের তৃতীয় গ্রন্থ লেনিনগ্রাদের ভারততাত্ত্বিক ই. ওয়াই. লিস্টারনিকের উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারত-রুশ আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিষয়ে প্রকরণ-গ্রন্থ। প্রায় ত্রিশটি কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত এতাবৎকাল অজানা দলিলের ভিত্তিতে এটি রচিত। এর সাহায্যে লেখক অনেক ভুলে-যাওয়া তথ্য ও ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে পেরেছেন, নানা সময়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে যে সব রুশ বা ভারতীয়রা সাহায্য করেছেন তাঁদের নাম পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ঔপনিবেশিকরাজ যদিও ভারতবর্ষকে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগযোগ স্থাপনে বাধা দিয়েছে তবুও গ্রন্থ-বর্ণিত যুগে ভারত-রুশ সম্পর্ক যে অপেক্ষাকৃত বিচিত্রতর পথে আত্মপ্রকাশ করেছে এই গ্রন্থে তা দেখানো হয়েছে। তখনই ভারত-রুশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। আর এই যোগাযোগই দুই দেশের প্রগতিমনা মানুষদের পারস্পরিক স্বার্থে মানবতাবাদী আদর্শের জন্য একতা বাঁধতে সাহায্য করেছে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে লিও টলস্টয় ও ভারতীয় দেশপ্রেমিক কৃষ্ণবর্মা ও মাদাম কামা এবং মহান সোভিয়েত লেখক ম্যাক্সিম গর্কির যোগাযোগ কি বিশেষ মনোযোগ দাবি করে না? বস্তুতপক্ষে, এই প্রকরণ-গ্রন্থে যে সব উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে তার তাৎপর্য কোনোমতেই খাটো করে দেখা চলে না। ভারত-রুশ সম্পর্কের ইতিহাস এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের বিচ্ছিন্নতা ঘোচাবার এবং অন্য দেশের অগ্রসর সামাজিক শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ভারতীয় প্রগতিবাদীদের প্রয়াসের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে।

ভারতীয় দর্শন-চর্চা

সোভিয়েত ভারতবিদ্যা গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল ভারতীয় দর্শন-চর্চা। আকাদেমিশিয়ান শ্চেরবাটস্কয় ও ওল্‌ডেনবার্গ রুশিয়ায় প্রাচীন

ভারতীয় দর্শন-চর্চায় পথিকৃৎ। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদেরা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তার বিষয়েও বিশেষ আগ্রহী। তাঁদের গবেষণার ফলাফল কয়েকখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে 'ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শন' নামে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ-সংকলন-গ্রন্থও আছে। এই সংকলনে সংগৃহীত প্রবন্ধের মধ্যে রামমোহন রায় ও অরবিন্দ ঘোষের দর্শন ও সামাজিক-রাজনৈতিক ধারণা সম্বন্ধে প্রবন্ধও আছে।

রামমোহন রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রবন্ধটিতে (ই. এন. কোমারফ প্রণীত) ভারতের জাতীয় বিকাশে এই অনন্যসাধারণ মনীষীর প্রগতিশীল ঐতিহাসিক ভূমিকার একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেওয়া হয়েছে। ঐ প্রবন্ধ-লেখকের মতে রামমোহন রায়ের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তা ঈশ্বর-বিশ্বাসী কিন্তু প্রত্যাদেশে অবিশ্বাসী ও যুক্তিবাদী। তাঁর ধর্ম-সংস্কার প্রয়াস ভারতীয় ইতিহাসে বুর্জোয়া ধরনের ধর্ম সৃষ্টির প্রথম প্রয়াসরূপে পরিগণিত হতে পারে। রামমোহনের ভাবাদর্শ সত্যই 'রিফর্মেশন' ও 'এনলইটেনমেন্টের' বিভিন্ন উপাদানের একটা অদ্ভুত সমন্বয়, যাতে আবার শেষোক্ত উপাদানই প্রাধান্য পেয়েছে দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তার বিকাশে উচ্চতর ঐতিহাসিক স্তর হিসাবে। রামমোহন রায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণাগুলি যে সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহেরই শুধু বিরোধী ছিল তা নয়, দেশের ঔপনিবেশিক শোষণেরও তা বিরোধী ছিল—যদিও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল্যায়নে সমালোচনার পাশাপাশি কিছুটা প্রশস্তির মনোভাবও তাঁর মধ্যে ছিল। অর্থাৎ, রামমোহন রায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব ভ্রূণ অবস্থায় ছিল উনিশ শতকের শেষাশেষি ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সামাজিক চিন্তায় যা থেকে দুটি বিরোধী ভাবধারার সৃষ্টি হয়, যথা—উদারনীতিক ভাবধারা ও প্রগতিবাদী ভাবধারা।

জাতিসমস্যা

আধুনিক ভারত, সমসাময়িক জগতে অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদেরা তার সম্পর্কে যে বিশেষ আগ্রহশীল তা আমি আগেই বলেছি।

'আধুনিক ভারতে জাতিসমস্যা' নামে এ এম. দিয়াকফ যে প্রকরণ-গ্রন্থ লিখেছেন তাতে আলোচিত দু-একটি সমস্যা সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে দু-এক কথা বলব। এই গ্রন্থে লেখক দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষ একটি বহুজাতিক দেশ কিন্তু এদেশের জাতীয়-সংহতি রক্ষা করাটা সব জাতিরই স্বার্থ, যদিও ভারতের বর্তমান অবস্থায় এই ঐক্য সংরক্ষণের কাজ নানা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে।

অধ্যাপক দিয়াকফ তাঁর গ্রন্থের ইতিহাস-বিষয়ক অধ্যায়গুলিতে দেখিয়েছেন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে (পুঁজিতন্ত্রের উন্মেষের যুগে) একদিকে যেমন সর্বভারতীয় বাজার সৃষ্টি হচ্ছিল অন্যদিকে তেমনি কোনো কোনো একই ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলে স্থানীয় শিল্প ও স্থানীয় বাজার গড়ে উঠছিল। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সংস্কৃতি গড়ে ওঠার আর্থনীতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করছিল এই প্রক্রিয়াটি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে দেখা গেল। পুঁজিতন্ত্রের অভ্যুত্থানের যুগে ইওরোপে যে জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ হয়েছিল এই আন্দোলন ছিল তারই অনুরূপ। এই ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের আন্দোলন কিন্তু সর্বভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধী ছিল না—যা ভারতের জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করছিল। এই আন্দোলন বস্তুতপক্ষে শেষোক্ত আন্দোলনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাও পরিচালিত হচ্ছিল ব্রিটিশ প্রভুত্ব ও ঔপনিবেশিক ভারতে জীইয়ে-রাখা কিছু সংখ্যক সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের বিরুদ্ধে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের আন্দোলন অনিবার্য-ভাবেই ব্যাপকতর আকার ধারণ করল এবং সংগঠিত চেহারা নিল। ১৯৫৬ সালে রাজ্যসমূহের পুনর্গঠনের ফলে, লেখকের মতে, প্রধানত দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের ভাষা তথা জাতিসমস্যার সমাধান হয়েছে। কিন্তু অন্য কতকগুলি অঞ্চলে এখনও এই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয় নি। ভারতের আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতি নিঃসন্দেহে অনগ্রসর জাতিগুলির বিকাশ ত্বরান্বিত করবে। এই জাতিগুলির অধিকাংশেরই বাস মধ্যভারতে ও আসামে। কিন্তু কোনো জাতির বিকাশ এবং তাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিমাত্রই বিচ্ছিন্নতাকামী ঝোঁক বলে গণ্য করা চলে না। এখনও পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাকামী ঝোঁকের চরিত্র সাম্প্রদায়িক, জাতীয় নয়। লেখকের সর্বশেষ

সিদ্ধান্ত হল এই যে জাতিসমস্যার যদি সুসমঞ্জস গণতান্ত্রিক সমাধান করা হয়, যদি সব জাতিকে বিকাশের সমান সুযোগ দেওয়া হয়, যদি কাউকেই বৈষম্য-মূলক সুবিধা না দেওয়া হয় তাহলে ভারতের জাতীয় ঐক্য রক্ষা এবং তার সুদৃঢ়করণের সমস্ত পূর্বশর্তই বিদ্যমান আছে। এই ঐক্য ভারতের সমস্ত জাতির পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষ চিত্র

যেসব গবেষণা ইতিমধ্যেই হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির এশীয় জাতিসমূহের ইনস্টিটিউট চার খণ্ডে ভারতের ইতিহাস প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে দুটি খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এতে আছে আধুনিক ও সমকালীন, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতেতিহাসের খণ্ড দুটি আমরা আগামী প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের সময় কিংবা তারও আগে প্রকাশ করতে পারব বলে আশা রাখি।

আমরা, সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদেরা আমাদের রচনায় পাঠকদের কাছে ভারতের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার একটি অপক্ষপাত চিত্র দেবার প্রয়াস করি। উপনিবেশবাদী ঐতিহাসিকদের সঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্তের হেরফের ঘটে। কারণ তাঁরা আধুনিক যুগে ভারতের ঐতিহাসিক অগ্রগতির দায়ভাগ ঔপনিবেশিক শাসকদের উপর অর্পণ করে তার প্রগতিশীল ও নেতৃত্বমূলক ভূমিকার গুণকীর্তন করেন এবং ভারতীয় জনসাধারণের মুক্তি-আন্দোলনকে মসীবর্ণে রঞ্জিত করতে চান। এই ঔপনিবেশিক ধারণা ভারতের অসামরিক ইতিহাসকে ব্রিটিশ ইতিহাসের অঙ্গীভূত করে তোলে। ভারতের ঐতিহাসিক গবেষণার মধ্য দিয়ে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তার ভিত্তিতে এই ধরনের ব্যাখ্যা এখন সংশোধিত করা হচ্ছে। ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা এখন নতুন দৃষ্টি নিয়ে তাদের দেশের ইতিহাস রচনা করছেন। আমরা তাঁদের এই দেশপ্রেমিক প্রয়াসের সাফল্য সর্বতোভাবে কামনা করি।*

* জানুয়ারী মাসে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ষড়বিংশ প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে পঠিত নিবন্ধের সারাংশ। ইংরেজী থেকে অনূদিত।

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বদেশীর স্রোতাবর্তে

সেকালে বিধাতা পুরুষ ষষ্ঠী দিনে কপালের লিখন লিখতেন। একালে বিধিলিপি লেখা হয় তিন থেকে সাত বৎসর জুড়ে। এ লিপি অবশ্য দৈবজ্ঞের অজ্ঞাত, মনোবিজ্ঞানীর পাঠ্য। স্মৃতিতে না দেখে তার দাগ দেখতে হয় বিস্মৃতিতে, চেতন-চিত্তে নয় অ-চেতন মনে। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত আমার সেই বিস্মৃতিলোক মন্থন করবেন একালের সেই সুরাসুরগণ, ফ্রয়েড্-য়ুঙ্-এ্যাড্লার-ও-প্যাব্লব্ গোষ্ঠী। আমার দৃষ্টি স্মৃতিতেই সীমিত।

'চেতনা প্রত্যূষে'

১৯০৫ সাল আমার তিন বৎসরের মনের উপর দিয়ে কী ভাবে বয়ে গিয়েছে, তা আমার অন্তত জানা নেই। স্বদেশী যুগের প্রথম যে স্মৃতি আমার মনে পা তা এই—এখন জানি এটা ১৯০৮ সালের ৩০-এ এপ্রিলের ঠিক পরেকার কথা, বয়স যখন আমার ছয় বৎসর। বাবার বৈঠকখানায় বসেছিলেন সেদিনের পাড়া একদল ভদ্রলোক, অনেকেই তাঁরা সরকারী কর্মচারী। সম্ভবত আমাদেরই একজন প্রতিবেশী পদস্থ সরকারী কর্মচারীর পুত্রের বা কন্যার বিবাহোপলক্ষে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রিত। আসনের অপেক্ষায় অপেক্ষা করছেন আমাদের বৈঠকখানায়। কারণ, গ্রীষ্মকাল, এ বৈঠকখানার দক্ষিণে আছে বড়ো পুকুর, ঘরের বড়ো বড়ো জানালাগুলো দিয়ে পুকরিণী 'শিকরণাং বোঢ়া' দক্ষিণের হাওয়া এসে সেই বৈঠকখানার মস্ত ফরাসটাকে গ্রীষ্মের দুপুরে আরামদায়ক করে। আলাপ-গল্পও তাই জমে উঠছে—যেমন জমে এরূপ স্থলে স্বভাবত। বোধহয় অন্দরে মাকে স্বস্তি দেবার প্রয়োজনেই আমিও ছিলাম এই আসরের এক কোণে বন্দী ; নিদ্রা যেতে আদিষ্ট বলেই বিনিদ্র। আমার

কানে গেল—মনেও গেঁথে রইল—সেখানকার একটি আলোচনা : "রেল-স্টেশনে আত্মহত্যা করেছে—ধরা দেবে না।" "কিন্তু আত্মহত্যা কেন করলে ?" "ধরা দেবে না বলে।" "না, পাছে পুলিশের অত্যাচারে বলে ফেলতে বাধ্য হয়, তাই।"

কী অভাবনীয় কারণে আমার শিশু-মানসে একটি চিত্র ফুটে রয়ে গেল—শার্টপরা বছর আঠারো-উনিশের এক বাঙালী যুবক, জন কয় পুলিশের হাত ছাড়িয়ে আপন কপাল লক্ষ্য করে গুলি করছে। মোকামা জংশন পরে অনেকবার পার হয়ে গিয়েছি—হয়তো আরো যাব ; কোথায় প্রফুল্ল চাকী আত্মবলি দিয়েছিলেন, তা দেখবার কথা প্রায়ই মনে জাগে নি, এখনো জাগে না। কিন্তু আমার স্মৃতিতে বাঙলার স্বদেশী যুগের প্রথম রেখাপাত ঐ আলোচনায়, তার প্রথম রেখাচিত্র ঐ ছবি। কেন তা মুছে গেল না, তা মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করুন। আমি জানি 'স্বদেশী যুগ' মুছে যাবার মতো নয় বলেই সে স্মৃতিরেখাও মুছে যায় নি। সেদিনের সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী ভদ্রলোকদের আলোচনায় যে সুরটি ছিল তাও তার যথেষ্ট প্রমাণ। বাঙালী ভীরুতার অপবাদ থেকে পৃথিবীর চোখে মুক্ত হচ্ছে,—আপনার চোখেও। একজনার আত্মদানের শক্তিতে সমূহের আত্মশক্তিও সেদিন কতকাংশে উদ্বুদ্ধ।

আমার স্বদেশী-চেতনার জন্ম বৈঠকখানার সেই ১৯০৮-এর মে মাসের টুকরো-টুকরো কথার আলোচনায়।

কালানুক্রমিকতার নিশানা ঠিক নেই—তবু মনে পড়ে ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিনে বেসরকারী স্কুলের ছাত্র আমার অগ্রজরা স্কুলে গিয়েছিলেন খালি পায়ে, শুধু চাদর গায়ে। মনে পড়ে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সপ্রশংস আলোচনা বাড়িতে, বাজারে, পথে-ঘাটে সর্বত্র—বহুজনের আত্মসচেতনতার তাও এক উজ্জ্বল উপকরণ। বিশেষ করে মনে পড়ে, বাজারে আমাদের ডাক্তারখানায় সাধারণ দোকানী কর্মচারীদের কথাবার্তা। দুনিয়ার অন্যতম আশ্চর্য সেই বাঙালী যুবকের প্রাণশক্তি—কারান্তরালে ফাঁসির অপেক্ষায় যাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, ওজন পায় বৃদ্ধি। ডাক্তারি শাস্ত্রেও নাকি এমন দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। কী সেই প্রেরণা যাতে মানুষকে দেয় মহামানবীয় রূপ, সামান্যকে করে অসামান্য !

অন্য রূপও মনে পড়ে—কুমিল্লায় নবাব সলিমুল্লার আগমনোপলক্ষে হিন্দু-

মুসলমান দাঙ্গা বেধেছে, ঢাকার ভলেণ্টিয়াররা কুমিল্লা যেতে চেয়েছে ; পুলিশ তাদের বাধা দেয়। নোয়াখালি শহরে অবশ্য উদ্দীপনার হাওয়া ঢাকা-কুমিল্লার মতো তপ্ত নয়। তবু শুনেছিলাম ছোটলাট ফুলারকে সম্বর্ধনা জানাবার তাগিদে সরকারী উকীল খাঁ বাহাদুরের হাত দিয়ে শহরের মুসলমান সাধারণকে নতুন চটি ও নতুন কেজ কিনে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ 'স্বদেশীর' সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ। দু-একজন মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন ; কিন্তু সাধারণভাবে তাঁরা নিক্রিয়। প্রচারে-প্ররোচনায় সেই বিচ্ছেদ ক্রমে বিরোধেও রূপ নেয়। 'স্বদেশীটা' তাই বিশেষ করে হিন্দুরই দায়িত্ব। আশ্চর্য নয় যে, জাতীয়তার শপথ নেওয়া হত পশ্চিমপাড়ায় বৃদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দিরে। লাঠিখেলারও ব্যবস্থা ছিল তার প্রাঙ্গণে। আমাদের চোখে তাই মনে হত স্বাভাবিক। মুসলমান ধর্মটা দেশের বাইরের ; ওই ধর্মাবলম্বীরাও তাতে বাইরের মানুষ থেকে গিয়েছে। দেশের আপনার হবার তাগিদ তো তাই তাদেরই হওয়া উচিত, আমাদের কী দায় ?

বাড়ির হাওয়া : যুগের হাওয়া

আমাদের বাড়ির আবহাওয়া কিন্তু তপ্ত স্বাদেশিকতার নয়। সাধারণ উৎসাহ আছে, বেহিসাবী উদ্দীপনা নেই। মামা অশ্বিনী ঘোষাল ছিলেন বাড়িতে স্বদেশীর পাণ্ডা। লাঠিখেলায় উৎসাহী। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। আমরাও তার প্রাঙ্গণে মাঝে-মাঝে সেই 'শির-মুণ্ডা-তামেচা'র মহড়া দেখতে যেতাম। শুনতাম, তলোয়ার-ডেগারের মহড়াও চলে—তবে গোপনে। স্বদেশীর উত্তেজনার প্রধান উৎস যে ওই গোপনীয়তা, এখন তা বুঝি। তখন বুঝলে হাসতে পারতাম। কিন্তু সবটাই কি তার হাসির ব্যাপার ? লাঠি-ডেগার পর্যন্ত বেআইনী, 'স্বদেশী' মাত্রই তো পুলিশের শিকার। তারপর আছে কয়েদখানায় তাদের উপর অত্যাচার—মারপিট, নখের নিচে সূঁচ ফুটিয়ে গোপন কথা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা। তবু সে তথ্য উদ্‌ঘাটন করলে অবশ্য দলের হাতে মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য। নিষ্ঠুর হলেও, আমরা সেদিন মানতাম, তা ন্যায়দণ্ড। এ সব কথায় হাসতে এখনো তাই পারি না। তবে ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে এখন আর নিঃসংশয় নই। মানুষ গেলে আর ফিরে আসে না—এই বোধটা এখন চরম ; ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তার পরে। মামা অবশ্য কিছুকাল পরেই নোয়াখালি ত্যাগ করেন। তার ওপরে পুলিশের তখন নজর পড়েছে।

তিনিও মোক্তারি পাশ করে ফেলেছিলেন ; নারায়ণগঞ্জে গিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু 'স্বদেশীর' সম্পর্কটা ত্যাগ করেন নি। ব্যবসায়েও মন দিতে পারেন নি। যতদূর জানি, অনুশীলন সমিতির কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন, সঙ্গে সঙ্গে গেঞ্জির কল, মোজার কল প্রভৃতি যত রকমের স্বদেশী কারবারে হাত পাকাতে-পাকাতে আর অর্থ নষ্ট করতে করতে ঠিক যখন পরিণত বয়সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে সত্যই একটা গেঞ্জির কল ঢাকায় গঠন করতে পেরেছেন, তখন সাধের স্বাধীনতার মাশুল জোগাতে তাঁকে সপরিবারে পাকিস্তান ছেড়ে আসতে হোল কলকাতায়—আবার নতুন পত্তন। বাড়িতে আমরা বাল্যে একমাত্র তাঁর শাসনেই সংযত থাকতাম, তাঁর লাঠিখেলা-শুদ্ধ স্বাদেশিকতা কৈশোরে তাঁর প্রতি ভীতি ছাড়াও একটা সম্ভ্রম সৃষ্টি করেছিল। তাঁকে মনের সামনে দেখতাম বড়ো করে, স্বভাবতই তাঁর 'কাজ'কে দেখতাম আরো বড়ো করে।

সে 'কাজের' খবর বিশেষ রাখতাম না তখনো। কিন্তু বাড়িতে খবরের কাগজ আসত বাঙলা সাপ্তাহিক, দৈনিকের দিন আসে প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে। প্রকাণ্ড বড়ো কাগজটার মধ্যে যত অদ্ভুত সংবাদ পড়তাম তার মধ্যে সর্বাধিক আকর্ষণীয় স্বদেশী মামলার কথা। পুলিশের দাখিল করা কথা কতটা সত্য কতটা মিথ্যা, তা এখন জেনেই বা কি হবে ? আমি কিন্তু অমৃত হাজরার নাম এখনো ভুলি নি, পরে দৈনিকের যুগে 'মোটাবাবু' রাসবিহারী বসু, পিঙ্গলে, শচীন সান্যাল প্রভৃতির নামও। সংবাদপত্রে দ্বিতীয় ধরনের আরেকটা সংবাদ ছিল—সাহেবের লাথিতে দেশী লোকের পিলে ফাটা। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই তা চলছিল। কিন্তু শুনছিলাম বোমার আবির্ভাবের পরে সাহেবরাও নাকি একটু এদিকে সাবধান হচ্ছে। "বোমা না ফাটালে পিলে ফাটানো বন্ধ হবে না," এ মর্মের একটা উক্তি সকৌতুকে মেনে নিয়েছিলাম। অবশ্য তা স্বদেশীর সবটা নয়। শ্বেতাঙ্গের হাতে ভারতের অন্যায় অত্যাচার, নিশ্চয়ই ভারতীয়দের মর্মদাহ জাগায়। কিন্তু স্বদেশীর প্রেরণা শুধু ওই বর্ণবিদ্বেষের নেতিমূলক স্বদেশী প্রতিক্রিয়া এবং সুভাষচন্দ্রের বিপ্লব সাধনারও উৎস তা'—যে বুদ্ধিমান বিদেশী লেখক ভারতীয় স্বাধীনতার সাধনাকে এরূপ প্রতিক্রিয়ারই প্রকাশ বলে ধরে নেন, তিনি নিজেকে ছাড়া কাউকে প্রতারিত করতে পারবেন না। পরেও ওরূপ কত পণ্ডিতী প্রতারণাই শুনেছি—বাঙলার বিপ্লববাদের কারণ যুবকদের অন্‌-এমপ্লয়মেণ্ট বা বেকার-ব্যাপ্তি। কিম্বা কিশোর ও তরুণদের

'হেলদি' খেলাধূলা, দৈহিক মানসিক অনুশীলনের অবকাশের অভাব। কিম্বা, একেবারেই অজ্ঞাত মনের ঈদিপাস্ কম্‌প্লেক্‌স্—পিতৃবিরোধিতা, অতএব, পিতৃকল্প সরকারের বিরোধিতা। একটা কথাই শুধু তাঁদের জানা নেই—পরাধীনতার মতো বাস্তব সত্য মানুষকে পাগল না করে পারে না। আমরা আবার যে যুগে জন্মেছি তা 'স্বদেশীর যুগ।' আকাশ-বাতাসে তখন উন্মাদনা। সে উন্মাদনা কোনো লর্ড কার্জনের কেন, কোনো লাট-গোষ্ঠীরই সৃষ্টির অসাধ্য। রবীন্দ্রনাথের ও 'জীবন-স্মৃতির' পাঠক তো জানেন, 'সঞ্জীবনী-সভা' এবং রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো পাগল দেশে অনেক পূর্বেই জন্মেছিলেন। যে মুহূর্তে জাতি পরাধীন হয় সে মুহূর্তে তার মনের কোনো না কোনো কোণে জমে এই পাগলামোর বীজ, জমে পরাধীনতার গ্লানি আর স্বাধীনতার কামনা। আমাদের কাউকে যখন জেলখানায় পোরে তখনি যেমন বুঝি এই লক্ষ্মীছাড়া কলকাতার আবর্জনা-ভরা পথঘাট, মাঠ-মানুষ কত চোখ জুড়োয়। উনবিংশ শতাব্দীর আগেই তাই এ বিক্ষোভেরও চিহ্ন মিলে—তখনো জাতীয় চেতনা জন্মে নি, কিন্তু পরাধীনতার বেদনা জন্মেছে। রামমোহন রায়ের পর থেকে তার রূপটা চোখে ফুটে উঠতে থাকে। তার অর্থ পাগলামোটা কেটে গেল, এমন নয়। তবে স্বাধীনতার তাৎপর্যটা বোধগম্য হতে লাগল—ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে। কেউ গৌণ পথে কেউ মুখ্য পথে সমস্ত শতাব্দী ধরে ওদিকেই পথ হাতড়ান। গৌণ পথটা সংস্কারের পথ, মুখ্য পথটা বিদ্রোহের পথ। সমরশাস্ত্রীরা বলেন—strategy of 'Indirect Approach' যুদ্ধে কম ফলপ্রদ নয়। যেখানে সংস্কারকের ও বিদ্রোহীর পথ এসে মিলে সে হচ্ছে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্পে, সাধনায়। এই জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সার্থক প্রকাশ আধুনিক বাঙলা সাহিত্য। বছর দশেক পূর্বে 'পরিচয়'-এ একবার আমাকে অত্যন্ত সংক্ষেপে বাঙলা সাহিত্যের মূল সুরটি বাস্তবত কী, তা লিখতে হয়েছিল। সে সুর হচ্ছে 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়।' সূত্রাকারে বল্‌লে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার দুর্বার প্রকাশ। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে এমন একজন বাঙলা সাহিত্যিকও কি আছেন যিনি এর ব্যতিক্রম? কারো বিদ্রোহের বাণী ফুটেছে আক্রান্ত লঙ্কাধিপতির স্বপক্ষে, কারো বাণী আরো স্পষ্ট—যদিও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আবরণে।

বৈঠকখানায় যত আলোচনাই শুনি তাকে ঘিরেও এই বাণীর প্রতিধ্বনিই বাতাসে সঞ্চারিত হ'ত। ঘরের বেড়ায় ঝুলত রামমোহন রায় প্রভৃতির

বাঁধানো ছবি। পুরনো 'বেঙ্গলী'র প্রচারিত দীর্ঘপটে ছিল কংগ্রেস সভাপতিদের প্রতিলিপি—ডব্লু.ই. সি. ব্যানার্জি থেকে রাসবিহারী ঘোষ পর্যন্ত। পার্শ্বেই ছিল ওরূপ আরও দুটি দীর্ঘপট—রুশ-জাপান যুদ্ধের উভয় পক্ষীয় সেনাপতিদের ছবি। তাঁদের নামও জানতাম। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতিদের নাম একাদিক্রমে মুখস্ত বলতে বললে ভুল হত না। তাঁদের কারো কারো মনীষার ও বাগ্মিতার কাহিনীও ছিল মুখস্ত। সেই সঙ্গেই জানতাম 'লাল-বাল-পাল' ও অরবিন্দ, এঁদের ছবি ঘরে রাখা বিপজ্জনক। স্বদেশীর গান বিশেষ শুনি নি, কিন্তু গানের বই বাবার বাক্সে ছিল; তা পড়তাম আর অনেক গান মুখস্তও ছিল। এরই মধ্যে যখন একদিন বাঙলা সাহিত্যের নেশার ডাকে আমরা দু' ভাই বাবার আলমিরা থেকে বঙ্কিম গ্রন্থাবলী দু' খণ্ড চুরি করে পড়তে আরম্ভ করলাম, সেদিন সেই নেশার ডাকের সঙ্গে নিশির ডাকও আমাদের পেয়ে বসল। আনন্দ মঠ! স্বপ্ন যখন ভাঙল তখন একবারও মনে হয় নি তার শেষাংশে ইংরেজ রাজ্যের প্রশস্তি প্রয়োজনীয় সাফাই ছাড়া আর কিছু। যে রাজত্বে ঘরে অরবিন্দ ও তিলকের ছবি রাখা নিষিদ্ধ, গীতা বিপজ্জনক, সে রাজ্যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী অন্য রূপে শেষ করা, মুদ্রিত করা ও প্রকাশিত করা যে অসম্ভব, এ কথা আমাদের কিশোর মন অবাধে মেনে নিতে পেরেছিল। অবশ্য বঙ্কিমের মতাদর্শ সেদিন বিচার্য হয় নি, সম্পূর্ণ বুঝতে পারতাম কিনা তাও সন্দেহ। কিন্তু বঙ্কিমের যা জীবন্ত দান তা জাতির জীবনের মধ্যেই তখন জীবন্ত। তার বিচার-বিশ্লেষণ তখনো অসাধ্য।

বঙ্কিম পথ

আজ বলতে পারি, বঙ্কিমের পথটা তবু বঙ্কিম পথ। জাতীয় ইতিহাসে বঙ্কিমের আত্মপ্রকাশে যেমন জাতির আত্মপ্রত্যয় লাভ ঘটেছে, জাতীয় বিভ্রান্তিতেও তেমনি বঙ্কিমের আত্মবিস্মৃতি জুগিয়েছে ভ্রান্তি। সত্যই বঙ্কিম 'হিন্দু জাতীয়তা'র বলবৃদ্ধি করেছেন। অবশ্য 'হিন্দু জাতীয়তা'র বনিয়াদ তিনি পত্তন করেন নি। আমাদের দুর্ভাগা ইতিহাসে সংস্কৃতিতে তা তৈরী হয়ে ছিল। 'বৃদ্ধ হিন্দু' রাজনারায়ণ বসুর বা 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দু মেলা' তা থেকেই সমুত্থিত। 'হিন্দু মেলা'রই নাম 'জাতীয় মেলা'। 'হিন্দু' ও 'ভারতীয় জাতীয়তা' তাঁদের কাছে সমার্থক। ভারতীয় জাতীয়তার এই স্ববিরোধী উপকরণ ভারতের ইতিহাসের মধ্যেই থেকে গিয়েছিল—আমরা পোষণ করে এসেছি অনেক মেলামেশার মধ্যেও পাশাপাশি দুই বিভিন্ন ঐতিহ্য। সাম্রাজ্যবাদী

শাসকেরা হিন্দু মুসলমানের সেই বিভিন্ন ঐতিহ্যকে বিরোধী বনিয়াদে পরিণত করত, আর করেছেও। যেখানে ভেদ নেই, যেমন কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, সেখানেও ভেদ সৃষ্টি করা তাদের কাজ। আমাদের তো ইতিহাসের মধ্যেই ভেদরেখা ছিল। আমরা বিরোধী না হই অনেক দিকে বিভিন্ন থেকে গেছলাম। বিদেশী শাসকদের পক্ষে তাই সুযোগটা তৈরী ছিল, তারা তা কাজে লাগিয়েছে। আর, আমরা তা জুড়ে ফেলবার মতো ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারলাম না, জোড়াতালি দেবার চেষ্টা করতে-করতে একেবারে ফেল করে বসলাম।

উনবিংশ শতাব্দীতে রাজ্যহারা মুসলমান জাত ওহাবী-উন্মাদনায় 'বিশুদ্ধ ইসলামের' জন্য আগ্রহান্বিত হয়। অন্যদিকে তখনি নবাবিষ্কৃত হিন্দু-সংস্কৃতির মহিমা-ছটায় হিন্দুরা ঝুঁকে পড়ে প্রাচীনতর হিন্দু ঐতিহ্যের দিকে। দু' সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাঁকটা তাতে আরও বাড়ে। আবার, ঠিক তখনি ইংরেজি-শিক্ষার সুযোগ নিয়ে হিন্দু মধ্যবিত্তরা পাঁচ শ' বছর পিছনে থেকে মুসলমানদের থেকে এক শ' বছর এগিয়ে গেল এক কদমে—বিশেষ করে বৈষয়িক জগতে। আর্থিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেই বরাবরের পিছিয়ে-পড়া ও হঠাৎ-এগিয়ে-যাওয়াদের খবর্দারি মানবে কেন রাজ্যবঞ্চিত অভিমানী মুসলমান? স্যর সৈয়দ আহমদ চাইলেন মুসলমানের জাগরণ—স্বমর্যাদায়, কিন্তু পৃথক সম্প্রদায় রূপে। তাতে করে সুযোগ-সুবিধার লড়াই আরম্ভ হতে বাধ্য। আরম্ভ হলও। অবশ্য লড়াইটা মূলত 'উপরতলার'—'বাবুজীদের' সঙ্গে 'মিঞা-সাহেবদের' চাকরি ও পদপ্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নিচের তলায় রামা কৈবর্ত ও রহিম শেখ খালি পেটে ধুকতে ধুকতে যে অস্থি-চর্মসার বলদ দুটোকে ঠেঙিয়ে একই ভাবে লাঙল ঠেলছিল, এ কথাটা 'বাঙলার কৃষক'-এর লেখক বঙ্কিমের মতো ভালো করে আর কেউ জানতেন কিনা সন্দেহ। তখন যদি রাজনৈতিক নেতারা এই 'রামা কৈবর্ত ও রহিম শেখ'দের শ্রেণীটাকেই আশ্রয় করে ভারতীয় জাগরণের বনিয়াদ রচনা করতেন তাহলে হয়তো ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলন অন্য পরিণতিতে পৌছতে পারত। কিন্তু কার ছিল সেই দৃষ্টি, সেই সাহস! বাঙলার রেনেসাঁসের মধ্যে এই লোকাভিমুখিতার অভাব ছিল। তবু দৃষ্টি বঙ্কিমের থাকবার কথা। প্রথম আন্তর্জাতিক ও সাঁ সাইমোঁ ব্রান্থির সাম্য-স্বপ্ন তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজন যখন জাতীয় চেতনা, জাতীয় আত্ম-মর্যাদাবোধের উদ্বোধন, বিশেষ করে জাতীয় সংস্কৃতির নব-স্থাপনা, তখন বঙ্কিম শ্রেণী-চেতনায় ও শ্রেণী-বিরোধে ভরসা রাখতে পারেন নি।

একবার বঙ্কিমের কীর্তি-অকীর্তি নিয়ে তর্ক হয়েছিল। ১৯৪৮-এর কথা। গোঁড়াদের বিরুদ্ধে তর্ক করতে গিয়ে আমিও কিন্তু গোঁড়ামি তখন করেছি, তবে আমার মূল বক্তব্যটা এখনো বদলায় নি। তা অনেকটা এরূপ: পরাধীন জাতির পক্ষে জাতীয় উদ্বোধনের উপকরণ খুঁজতে হয় জাতির অতীতে। সেই দৃষ্টিতে ইতিহাসের পুনরাবিষ্কারও করতে হয়। তাতে দেখা দেয় ঐতিহাসিক নাট্য উপন্যাস,—তাকে রোমান্টিক বললেই যথেষ্ট হয় না, তা মহদাশয়ের অভিব্যক্তি, উজ্জীবন—জাতীয় আশার, সাহসের উদ্বোধন। বঙ্কিম ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিক ও নাট্যকাররা এ চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসের যে পটটি তাঁরা আলেখ্য রচনায় গ্রহণ করেন তা হচ্ছে আক্রমণকারী ও আক্রান্তের সংগ্রামের ইতিহাস, হয়তো মন্দভাগ্য বিজিত ও পরাক্রান্ত বিজেতার দ্বন্দ্বের ইতিহাস। কিন্তু তাতে বিপদ ঘট্‌ল এই যে, এতো শুধু অসুর বৃত্রের বিরুদ্ধে দেবতাদের কথা নয়, আলেকজেন্দারের বিরুদ্ধে পুরুর বিক্রমের কথা নয়—এমন কি, দু-একজন চাঁদ সুলতানার বীরত্ব কাহিনীও নয়। পটটা যে প্রায়ই পরাক্রান্ত মুসলমান বিজেতার সঙ্গে আক্রান্ত হিন্দু রাজাদের দ্বন্দ্বের কথা। পরাধীন ভারতবাসীর সহানুভূতি ও বিরাগ তাতে কোন পক্ষে যায় তা সহজবোধ্য। পেট্রিয়টিজম্-ও তাই হিন্দু রঙে রঞ্জিত হতে থাকে; আর, ভারতের মুসলমান পেট্রিয়টের পক্ষে তা সহজগ্রাহ্য হতে পারে না। জাতীয়তার অখণ্ডানুভূতি গড়ে উঠবার পক্ষে এই বহিরাবরণটাও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্কিমের সৃষ্টির সূত্রে অতীতের সেই ঐতিহ্যের বিভেদ লুপ্ত হল না।

জাতীয় আত্মমর্যাদার পাদপীঠ হিসাবে বঙ্কিম যে সাংস্কৃতি-ভূমি রচনা করতে চান তা আরও দুষ্প্রবেশ্য। কোঁৎ-মিল-স্পেন্সার-এর সঙ্গে তাল ঠুকে তিনি দেখালেন পাশ্চাত্ত্য কাল্‌চারের যা শ্রেষ্ঠ আদর্শ তা আমাদের গীতাতে বহু পূর্বে ঘোষিত, আর কৃষ্ণচরিত্রে চিরদিনের মতো মূর্ত। মনীষার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তাতে বঙ্কিম, নিজের আন্তরিক আগ্রহেরও। কিন্তু ওরকম অনুশীলন-ধর্মে রামা কৈবর্ত ও রহিম শেখের কি প্রবেশ সম্ভব? এক-আধজন খ্রীষ্টান পি. মিত্র যদি-বা অনুশীলনের মর্মোপলব্ধি করে থাকেন, কোনো শিক্ষিত মুসলমান তাতে প্রভাবিত হবেন কি করে? বরং তাতে করে যা হয় তা হচ্ছে খাঁটি দেশপ্রীতির সঙ্গে চোলাই-করা হিন্দুত্বের রসায়নে হিন্দু মধ্যবিত্তের মনে 'হিন্দু জাতীয়তা'রই পুষ্টি। বঙ্কিম তা করেছেন—এটা তাঁর দুর্ভাগ্য, আমাদেরও দুর্ভাগ্য। তাঁর দুর্ভাগ্য, ঐতিহ্যের বিভ্রান্তি ছাড়িয়ে তিনি

ইতিহাসের সত্যপথ দেখতে পান নি—রবীন্দ্রনাথের পূর্বে তা স্পষ্ট করে কেউ দেখতে পান নি। আমাদের দুর্ভাগ্য, বঙ্কিমের সৃষ্টি-প্রতিভা ও বঙ্কিমের অসামান্য মনীষা এই বঙ্কিম-পথকে একই কালে মোহন ও গ্রাহ্য করে তুলল—অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র কেন, গোটা স্বদেশী আন্দোলনটা তার জের টেনে চলে। প্রতিভা যখন বক্রপথ নেয় তখন জাতির দুর্ভাগ্য, এ প্রসঙ্গেই এ কথা আমি পূর্বে বলেছি। কিন্তু কী কারণ-পরম্পরায় তা সে বক্রপথ গ্রহণ করে, তা বুঝতে না চাওয়াও মন্দবুদ্ধি। রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বঙ্কিমের সাক্ষাৎ হলে সেই ভক্তপুরুষ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বঙ্কিম বাঁকা কেন?" বোধহয় গীতা ও কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যায় সরল ভক্তির স্বাদ না পেয়েই সেই মহভক্তের বঙ্কিমকে এই পরিহাস। বঙ্কিমের উত্তরও অর্থসূচক। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "জুতোর চোটে।" বঙ্কিম-প্রতিভার বিশ্লেষণের এইটিই মূলসূত্র। পরাধীনতার জ্বালা, জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার অনির্বাণ আশা, জাতীয়-সংস্কৃতি রচনার দুর্বার প্রচেষ্টা বঙ্কিমের প্রতিভাকে বাঁকিয়ে দিয়েছে। রসস্রষ্টা, রূপস্রষ্টা বঙ্কিম নিজের সৃষ্টি-বোধকেও তার প্রভাবে খর্ব করেন; আর শেষ পর্যন্ত আপন প্রতিভাকে উৎসর্গ করেন সেই আদর্শের তাড়নায় ধর্ম প্রচারে।

অনেক বাড়িয়ে বলতে হল—বলা দরকার। এতে ভুল যদি থাকে তবু আমার জীবনোপলব্ধিতে এইটিই সত্য। প্রথম কথা, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র (রবীন্দ্রনাথ এই সঙ্গে গণ্য নন, কিন্তু বিবেকানন্দ গণ্য) প্রভৃতির লেখা পড়ে আমাদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় কথা, বঙ্কিম-বিবেকানন্দের প্রেরণায় বেশ কিছু পরিমাণে ছিল 'হিন্দু স্বাজাত্য', তখনো তা চোখে পড়ে নি, কারণ স্বদেশী আন্দোলনের শেষ জোয়ারেও হিন্দুত্বের ঢেউ বইত। পরেও তার বিভ্রান্তি কাটাতে চেষ্টা করতে হয়েছে, কিন্তু সে পরের কথা, ১৯২৩-১৯২৭-এর। তৃতীয় কথাও কিন্তু সত্য: স্বদেশীর সেই ভাবাদর্শকে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের প্রেরণা 'হিন্দু স্বাজাত্যের' সঙ্কীর্ণ খাতেই বদ্ধ করে রাখে নি, বরং নিজের নিয়মে তাকে এগিয়ে যাবার জন্য পথ করে দিয়েছে—এইটিই আমার সাক্ষ্য।

আমার পক্ষে আরও একটা কথা আছে। প্রথম থেকেই সাহিত্য আমার কাছে স্বাধীনতার প্রেরণার বড়ো পরিপোষক। তাতে যেমন স্বপ্নে মেতেছি, তেমনি অনুভব করেছি পরাধীনতার গ্লানি। তাই যতই এগিয়ে চলেছি ততই একটা ধারণা দৃঢ় হয়ে উঠেছে—আত্মপ্রকাশই হচ্ছে জাতির ও মানুষের

সাধনা। তাতেই তার আত্মবিকাশ। সেই আত্মপ্রকাশেরই একটা পথ সাহিত্য। রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে যতই নাগপাশে বাঁধা থাক কোনো জাতি, একবার যদি সে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে তা হলে সে নিজে পায় আত্মবিশ্বাস, আর পৃথিবীতে তার পরিচয় হয়ে যায় প্রতিষ্ঠিত। তারপরে রাজনীতিতে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ঠেকিয়ে রাখা যায় কতক্ষণ? রবীন্দ্রনাথ নোবল পারিতোষিক লাভ করলে এই এগারো-বারো বছরের বালক তার অগ্রজ অভিভাবকদের মুখে যা শোনে তাতে বুঝেছিল—জাতির সে মর্যাদা কোনো ইংরেজ রাজশক্তির সাধ্য নেই আর খর্ব করে। সেই সঙ্গেই আবার অনুভব করেছি, যতক্ষণ রাজনৈতিক মর্যাদা লাভ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই আত্মপ্রকাশের সাধনাও কিন্তু অসম্পূর্ণ। আমার কথাটা তাই এই—জাতীয় আত্মপ্রকাশের এই সাধনাই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীকে পাগল করে। সকল দিকেই সে পথ খোঁজে। দুটি বিশেষ দিকে সে পথ পায়—সাহিত্য-সাধনা ও স্বাধীনতার সাধনা। শুনেছি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মনে করতেন—এ কালের বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় বাঙলা সাহিত্য। আমি বলি হাঁ, এবং তার স্বাধীনতার আন্দোলন। শুধু তাও নয়। আমার কথাটা এই—বাঙলা সাহিত্যের পরিচয় সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি বুঝেছি, ও বলেছি, "সাহিত্য-সাধনা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম—মূলত একই সত্যের দু' পিঠ।" বিশেষ করে আমার এ অনুভূতি বঙ্কিমের ও রবীন্দ্রনাথেরই দান। আমাদের সাহিত্যিকরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন, আমাদের রাজনীতিকরাও সাহিত্যের উজ্জীবনে হতেন প্রবুদ্ধ। উদ্বোধন-সঙ্গীত ছাড়া আমাদের রাজনীতিক সভাও হয় না, কংগ্রেসও না। অন্য কোনো দেশে এ রেওয়াজ আছে কি? স্বদেশী যুগ তো বিশেষ করে ছিল বাঙলা সাহিত্যের একটা প্রবল প্রকাশের যুগ—কাব্যে গানে দেশের আকাশ মুখরিত হয়েছে তখন। আমরা তার শেষ দিকে এলেও পথে-ঘাটে গল্পে আলোচনায় পেতাম সেই স্বাদ।

(ক্রমশঃ)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলাপ হয়ে উঠবে

(পূর্বানুবৃত্তি)

এমনি করেই দিন গড়িয়ে যায় শান্তনুর।

ওর নিজের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ও-একটা অবস্থিতি মাত্র—ভূমিকা-বিহীন চরিত্র।

খাবার টেবিলে কদাচিৎ উপস্থিত থাকে। দাদাদের এড়িয়ে চলে। সুব্রতর সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয়। মমতার খবর বেণুর কাছ থেকে মাঝে মাঝে পায়। আর একদিন মমতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথা হয়নি।

বেণুর কথাবার্তায় আর মনে হয় না ও কোনোদিন স্কুলে গিয়েছে। আস্তে আস্তে ওকে গ্রাস করছে ওর দিনকাল। আজকাল ও কেমন ছটফটে হয়ে গিয়েছে। দুপুরের দিকে প্রায়ই থাকে না। শান্তনুর গরমের ছুটি পড়েছে। রেস্তোরাঁর ঘুপচি কোণে শান্তনু এখন অনেক বেশি সময় কাটায়। জর আসার সময়ে ঝিমিয়ে পড়ে।

সেদিন বিকেলে মমতাদের বাসার সামনে বেণু আর মমতার সঙ্গে শান্তনুর দেখা হয়ে গেল। বেণু কিসের পয়সা বুঝিয়ে দিচ্ছে, মমতা গুণে নিচ্ছে। মমতা শান্তনুকে দেখে হাসল। বেণু না হেসে বলল—আসুন। শান্তনু ওদের ঘরে গিয়ে একটু অস্বস্তি বোধ করল। মমতার বাবা নেই। তবু মমতা বসাল।—চা খান। এটা ওটা সে নানা বিষয়ে কথা বলতে লাগল। খানিক-বাদে বেণু চলে গেল। মমতা গল্প করতে লাগল, বেশির ভাগ বেণুর গল্প। ও বলল :

—বেণুকে আমি বলি ওরই মধ্যে সময় করে পড়তে।

—তুমি নিজে পড় না কেন?

—আমার সময় কোথা?

—কী কর সারা দুপুর?

—ডাল ভাজি, বাদাম ভাজি, প্যাকেটে পুরি, চানাচুর বানাই।

—বিক্রি কর?

—আমি নিজে পারি না। বেণুকে দিয়ে দোকানে দোকানে পাঠাই।

—কেন?

—না হলে চলবে কী করে? বাবা তো কাজে যান না আর।

—বাবাকে জানিয়েছ সব?

—ওরে বাবা, পিঠের চামড়া থাকবে না তা হলে।

—তোমার বাবার ব্যাপার-স্যাপার বোঝা যায় না। না?

—কী করবে বলুন, বাবার বড় কষ্ট, বোঝানো যায় না বোলে।

—তা অবশ্য—মানে—

—আমার মা? আপনি জানেন না কিছু?

—মা নেই তো তোমার?

—আমার মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। মানে মরে যায়নি। চলে গেছে। তাই বাবা ওইরকম হয়ে গেছে।

—বুঝলাম। তাই মদ খান। কিন্তু তোমার ওপর অবিচার করেন কেন?

—সেটাও ইচ্ছেয় করেন না। জানেন আমার বাবা আমার মাকে ভুলতে পারে না। কোনোদিন পারবেও না। বাবার ভয়, আমিও তো মায়েরই মেয়ে আমিও হয়তো চলে যাব। মদ খেলেই মায়ের ওপর রাগটা জ্বলে ওঠে—মায়ের মেয়ের ওপর সেই রাগটা পড়ে। সেজন্যেই সেদিন বলেছিলাম যে উনি ঠিক আমাকে মারেন না।

—সেটাই কি ভালো কথা?

—ভালো কথা তো মায়ের চলে যাওয়াটাও নয়।

কালচে রঙের খানিকটা চা একটা কাঁচের গ্লাসে ঢেলে শান্তনুর দিকে এগিয়ে দিল। নিজে একটা কলাই-করা বাটিতে ঢেলে নিল। শান্তনু দেখল কী রোগা মেয়েটা। কণ্ঠার হাড় প্রকট—গালের ওপর একটা নীল শিরা কখনো দেখা যায়, কখনো মিলিয়ে যায়। চোখ তুলে শান্তনুর দিকে তাকিয়ে সে বলল—ভালো কথা তো কোনোটাই নয়। এ বাড়িতে ওদিকটায় এক বড়বাবু থাকে। বৌ বাপের বাড়ি গেছে ছেলে হতে, চারটে ছেলে-মেয়ে। সে যা বলে আমায়, তার একটাও ভালো কথা নয়—বলে আচমকা হেসে গড়িয়ে পড়ল মমতা। তারপরেই গম্ভীর হয়ে গেল, বলল—বেণুকে বলতে হবে একদিন!

—কেন ?

—ও যা খেপে যায় এসব শুনলে না—

—যাক, তুমি এসব লোকের সঙ্গে বেশি কথা বোলো না।

—খুব জানি, আমি অনেক দেখেছি ওসব লোক।

চা খাওয়া শেষ হতে না হতে মমতা আবার গম্ভীর হয়ে গেল। হাসিটা যেন অনেকটাই বাজে খরচ করা হয়েছে এই ভেবে মমতা একটু বেশি করেই চুপ হয়ে গেল। ঘরের জানলা দিয়ে বাড়ির উঠোন দেখা যায়। এক ঝাঁক সা-জোয়ান মানুষ বিড়ি খাচ্ছে, তাস পিটছে। ময়লা ন্যাতা-হয়ে-যাওয়া তাস। কড়ায় ঝামা ঘষছে গা-খোলা বৌ। কেশে দম ফাটাচ্ছে একটা বুড়ো। সেজেগুজে বেরিয়ে গেল একটি মেয়ে। বুড়োটা কাসছে আর ফাঁকে ফাঁকে চেঁচাচ্ছে—ভগবান কোথায় আনলে, চারদিকে একটা মানুষ নেই। রাজ্যের স্মাগলার, ফোরটোয়েন্টি, হাফ-গেরস্ত, মাতাল—আমরা সেনহাটির চৌধুরী, বামুনে পজ্জন্ত সমীহ করে আমাদের সঙ্গে কথা বলত, আর এখানে—বৃথা। কেউ শুনছে না। কেউ দেখছে না। একরাশ স্তূপীকৃত ময়লা কাপড়ের ওপর এক চিলতে সাবান রাখতে রাখতে বুড়োর ছেলের বৌ বোধহয় ধমক দিল বুড়োকে। মেয়েটার মুখ দেখলে মনে হয় যেন ষড়যন্ত্র করছে। সে বলল—উনুনে আঁচ পড়ে না দু-বেলা গলায় দাপট আসে কোথা থেকে ?

—তুই যা নিয়ে আয় ওদের মতো করে দাপটের সামগ্‌গিরি।

—মুখে পোকা পড়বে, চুপ করো।

—তার আগে যেন তোদের গতরে পোকা পড়ে।

এইসব চেঁচামেচি শুনতে শুনতে মমতা শান্তনুকে বলল—মেয়েটা বুড়োর চতুর্থ পক্ষ।

শান্তনু বলল—বড় নোংরা জায়গা। বাবাকে বলে উঠে যাওয়া উচিত তোমাদের।

—বাজে বকবেন না।

—কেন ?

—ভালো জায়গায় উঠে গেলে রোজ দুপুরে বাবার মাতলামি চলত না, পাড়ার লোক শেষ পর্যন্ত বাবার ওপরেই চড়াও হত ?

—তা বটে।

—শুধু তাই নয় ভালোলোকেরা দল বেঁধে আমাদের সব খবর হাঁ করে গিলতে চাইত, নানা কথা জিজ্ঞাসার ঠেলায় ঘরে দোর দিয়ে বসে থাকতে হত। সে যে কী যন্ত্রণা জানেন না।

—ঠিকই।

—যখন তখন বেণুর আসা নিয়ে হাঙ্গামা হত। হত না ?

—হত।

—এ তার চেয়ে অনেক ভালো। বড়বাবুকে সবাই জানে। জানা শত্রুতে বিপদ কম। উনি আমার গায়ে হাত দিতে চান একথা বুঝে ফেললে আর বিপদ কিসের ?

শান্তনুর মনে হল যে বলে, তুমি বয়সের তুলনায় বড় পেকে গেছ। মমতা যেন ওর মনের কথাটা শুনতেই পেল। বলল—সব দেখে দেখে আমার চোখে চড়া পড়ে গেছে।

ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুর। আনত নিমডালে কাকেদের মেলা। গলির বুকে কোনো পায়ের শব্দ নেই। বড় রাস্তা থেকে বাসনওয়ালার কাঁসর টং টং শোনা গেল। শান্তনুর চোখে দুপুরের ঘোর। মমতাকে যত ছোট ভাবা যায় মমতা তত ছোট নয়। মমতা অন্তরঙ্গতায় অসঙ্কোচ, বলে চলল—দু হাতে আর ঘাড়ে পাঁচড়া হয়েছিল, সে এক রকম ছিল ভালো। ঘেন্না করত সবাই। এখন ফটিকবাবুর ইঞ্জেকসনে সেগুলো আবার সেরে গেছে। সবাই কাছে ঘেঁষতে চায়। ইয়ার্কি দিতে চায়!

তারপর অনেকক্ষণ মমতা রইল চুপ করে। শান্তনু আপন মনে উসখুস করল। একটা ছেঁড়া পুরনো কাগজ আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলে। ফাঁকে ফাঁকে দেখল মমতা ভাঙা তক্তাপোষের ছেঁড়া তোষক বৃথাই ঢাকবার জন্য ব্যস্ত। রিকসায় মাইক বাজিয়ে সিনেমার নতুন বইয়ের প্রচার করে গেল। একটা পাকানো হ্যাণ্ডবিল জানলা দিয়ে মমতাদের ঘরে এসে পড়ল। তারপর আবার চুপচাপ। সব গোলমাল থিতিয়ে গেল যেন। শুধু কাকেদের কর্কশ গৃহস্থালীর কলমল ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের সঙ্গে এক হয়ে মিশে রইল। মমতা তখন আস্তে আস্তে মুখ তুলে শান্তনুকে বলল—আপনি কিন্তু খুব ভালো। 'কিন্তু' শব্দটায় শান্তনু সান্ত্বনা পাবে না দুঃখ পাবে বুঝতে পারল না। শুধু দেখল কোথা থেকে একঝলক রক্ত এসে মমতার মুখখানা লাল করে দিয়েছে।

ফটিকবাবু গম্ভীর হয়েই বললেন—নাও তোমার এক্সরে প্লেট।

—কী দেখলেন? সোফাটায় আরাম করে বসে শান্তনু নিরুদ্বেগ মনে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

—একটু সাবধানে থাকলে, আর এই ইঞ্জেকসনের কোর্সটা নিলে ঠিক হয়ে যাবে। তবে সাবধান হতে হবে কিন্তু।

—তার মানে কিছু হয়েছে?

—না বলতে পারলেই খুশি হতাম। তবে—

—আপনাকে অত সঙ্কুচিত হতে হবে না। কিন্তু আমাকে দেখলে অসুখ আছে বলে মনে হয় না তো।

—মনে হওয়াটাই সব নাকি? আমাকে দেখ'লে কী মনে হয়?

—ডায়েবিটিস আছে, হার্ট দুবলা হওয়া বিচিত্র নয়, ব্লাডপ্রেসার নির্ঘাৎ,—

—অথচ একটাও নেই। একটা পুরো মুর্গি, এখনো এই ফর্টিফোর চলছে বুঝলে টেরই পাইনে। রাত্রে একবারও উঠিনে।

—কনগ্র্যাচুলেশন্‌স্‌।

—আর তোমাদের বৌদি মানে আমার স্ত্রী, দেখেছ তো সেদিন, কীরকম?

—সরলভাবে বলতে গেলে পরমাসুন্দরী।

—এ্যাই, সকলেই তাই বলে। অথচ গলায় ফানিন্‌জাইটিস, আর একটু নামো ব্রঙ্কিয়াল প্যাচ, একটু এ্যাজমাটিক, আরো নামো লিভারে গোলমাল, ইউরিনে এ্যালবুমেন—বাট শি ইজ বিউটিফুল, ইজ ন্‌ট শী?

—নিঃসন্দেহে।

—তাই অসুখ তোমার প্রচ্ছদ পাল্টাচ্ছে কিনা, তোমার মানসিক শান্তি, হাসিমুখ নষ্ট করে দেবে কিনা এটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল তুমি রুগ্ন কিনা, তোমাকে লড়ে যেতে হবে কিনা?

শান্তনু চুপ করে রইল। আমি অসুস্থ অথচ আমি সুন্দর একথার কোনো মানে নেই। রোজই জর হয়। রোজ বিকেল হলেই। ফটিকবাবু ছাই-দানিটায় সিগারেট টিপে ধরে নিবিয়ে ফেললেন। তারপরে আবার বললেন:

—তুমি ভালো অথবা আমার স্ত্রী সুন্দর তাই বলে রোগ পুষে রাখার অধিকার কারো নেই। শান্তনু, ভালোকে ভালোবাসি বলেই তাকে রক্ষা করার লড়াইও করে চলতে হবে। তুমি বাংলাদেশের নদীর বুকে জ্যোৎস্না দেখনি, মাঠের বুকে সূর্য-ডুবে-যাওয়া? শোনো নি ফাল্গুন মাসে আমগাছে

কোকিল ডাকা—সুন্দর না? নিশ্চয়ই সুন্দর। কিন্তু সেই কারণেই তো মুখ ফিরিয়ে থাকা চলবে না। চোরাবাজার, অবিচার, দুর্নীতি, শোষণ একটা সুন্দরী মেয়ের বুকের টি. বি. জার্মের মতো কুরে কুরে খাচ্ছে।

শান্তনু শুনছিল। আর নিজের বুকের এক্সরে ফটোর দিকে নির্ণিমেষে তাকিয়েছিল। রোগ কোথায় সে জেনেছে। কিন্তু লড়াই করার কোনো উৎসাহ সে অনুভব করে না। ডাক্তারবাবু জানেন না—আসল রোগ রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছার অভাব। ফটিকবাবু বললেন—আমার ভাবপ্রবণতার কোনো মানে হয় না, কিন্তু এক এক সময় তোমাদের বৌদিকে, আই মিন আমার স্ত্রীকে মনে হয় গোটা বাংলাদেশের রূপক। এত সুন্দর—এত সুন্দর—কিন্তু ব্যাধি তার সর্বাঙ্গে। সব মিলিয়ে ভালোবাসাটা আদর্শে গিয়ে দাঁড়ায়।

পর্দা সরিয়ে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ঢুকলেন।—সেই বুড়োটা কইমাছ এনেছে আবার। সেদিনের মতো খুব বড়। দেখবে?

—অফ কোর্স। উঠে পড়লেন ডাক্তারবাবু। শান্তনু বলল—এ্যান্টি ক্লাইম্যাকস। হেসে ফেলল সবাই।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে শান্তনু ভাবল এ একরকম হল ভালো। ছুটি। ছুটি সব কিছুর হাত থেকে। ক্ষমতা অক্ষমতা, সফলতা ব্যর্থতা, প্রতীক্ষা প্রত্যাখ্যান—সব কিছুর কাছ থেকে তার ছুটি। খাবার টেবিলে দাদাদের নব নব সাফল্য-মৃগয়ার কাহিনী আর তাকে শুনতে হবে না। বৌদিদের পতিগর্ব আর পিতৃগর্বের প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার সাক্ষ্য আর তাকে বহন করতে হবে না। রুচি রমেনকে ভুলে গেল কিনা, সুব্রত ভুল করছে কিনা, আর কিছুই তার মাথা ঘামাবে না। কদিন ধরে তার নিজের মনের কোণে সঙ্গোপনে অথচ সযত্নে একটা কোমলতার পুতুল নিয়ে সে নাড়াচাড়া করছিল। তার ভাবনা হয়েছে মাঝে মাঝে গ্রীক কিম্বদন্তির সেই মর্মরশিল্পীর মতো সে হয়তো নিজেরই গড়া পুতুলের কাছে কিছু চেয়ে বসবে। এখন তা থেকেও মুক্তি। মমতাকে আর তার কোনো ভয় নেই। সে নিঃসঙ্কোচে, বিনা আশায় বিনা ভাষায় মমতার কাছে যেতে পারে। নাও যেতে পারে। দাদাদের কাছে খবরটা দিলে এখুনি হয়তো হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। সেখানেও প্রতিযোগিতা। হয়তো একটা স্যানাটোরিয়ামের ব্যবস্থাও হতে পারবে। কিন্তু না। ওসবের দরকার নেই। বাইরে যাওয়া যে না যায় তা নয়। কিন্তু সে খুব দূরে যাবে না। কাছেই কোথাও পারলে চলে যাবে সে। চলেই যাবে।

পুরোপুরি ব্যর্থ হতে পেরে শান্তনু যেন পরম কৃতার্থ হল। ব্যর্থ হতে ভুলে গিয়েছে বলেই মানুষের এত গ্লানি। ব্যর্থতাকে সবাই ঘৃণা করেছি। কৃপণের মতো সাফল্যের স্বর্ণমুষ্টি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছি। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে শান্তনু অনুভব করল একটু চা পেলে ভালো হত। সে স্টেশনের কাছেই এসে পড়েছে। রেস্তোরাঁটা আর একটু দূরে। মোড়ের মাথা থেকেই সে দেখতে পেল রেস্তোরাঁর পাশে লাগানো সিগারেট কাউন্টার থেকে সুব্রত হাত তুলে ওকে চেনা দিল।

সুব্রত বলল—ভেতরে চল, খুব দরকার। ওরা ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে ছেঁড়া জামার নিচে কী একটা সামলে ধরে দোকানে এসে ঢুকল বেণু। শান্তনুকে দেখে ও যেন একটু কঠিন হয়ে গেল। ওদের উপেক্ষা করেই সে এগুচ্ছিল। সুব্রত চিনত না বেণুকে, তবুও ওর রকম-সকম দেখে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলল—তোর জামার নিচে কীরে ?

বেণু বলল ভাঙা কর্কশ ভারি গলায়—মালের বোতল।

শান্তনু আর সুব্রত একটা খুপরির দিকে যাচ্ছিল। বেণু বলল—ওদিকটায় যাবেন না। অন্য খদ্দের আছে।

ওরা আর একটা খুপরির দিকে চলে গেল। সোডার বোতলের ছিপি খোলার শব্দ কানে এল। গেলাসে তরলপদার্থ ঢালার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে বেণুর খিলখিল হাসি। কাকে যেন বলছে বেণু—এই মাল যোগাতেই হিমসিম আবার অন্য—দুটো চা আর দুটো ওমলেটের জন্য বলে দিয়ে শান্তনু আর সুব্রত বসে থাকল। ভেসে আসছে বরফ ভাঙার ভোঁতা আওয়াজ। অরেঞ্জ স্কোয়াশের বোতল রাখার কাচ-কঠিন শব্দ। "দুটো চা—একটায় চিনি নয়।" "তিন নম্বরে কাটলেট দুটো, ডেভিল একটা।" চামচ কাঁটা ছুরির মৃদু ঠন্‌ঠনানি। পাখার সোঁ সোঁ—"পাঁচ নম্বরে দু-টাকা সাড়ে পাঁচ আনা।" বড় রাস্তার মোড়ে কোন্ সেলাই মেসিনের নিওন-জ্বালা বিজ্ঞাপন জ্বলছে নিভছে। রেস্তোরাঁয় হাসির হর্‌রা সোডার বুড়্‌বুড়ির মতো দেখতে দেখতে মিলিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পর্দা উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। ওরা অনেকক্ষণ চুপ করে মুখোমুখি বসে রইল—যেন কথা নেই। চায়ে চামচে ডুবিয়ে নাড়তে নাড়তে অনেকক্ষণ পরে সুব্রত বলল—শান্তনু। আর কী আশ্চর্য ঠিক তখনই শান্তনু বুঝতে পারল সুব্রত কী বলবে।

[বলে ফেল সুব্রত, কিছু ভয় নেই, বলে ফেল। এই রকমই হয় এই

রকমই হয়ে থাকে। এতে সঙ্কোচের কিছু নেই। ঢোক গিলতে হয় অমন—গোটা ভারতবর্ষে দেখতে পাচ্ছ না, ওতে লজ্জা কিছু কাজের কথা নয়। আমরা যারা ঢোক গিলব না তাদের ফুসফুস ঝাঁজরা হবে শুধু। এ রকম ভালোই হল। হয়তো তোমার মনে হচ্ছে ঠিক হল না। রুচিরও তাই মনে হতে পারে। হয়তো এই সেদিনের ঘটনাগুলো এখন আরো তীব্র হয়ে মনে পড়ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে কি তোমাদের যে শান্তনু সাচ্চা লোক ? তার সমর্থন যদি পাওয়া যায় বিবেক তাহলে পালকের মতো হাল্কা হয়ে যাবে ? আমাদের অনগ্রসর ভাইবেরাদর এমনি করেই পুরোহিতের পাঁতি আনতে ছুটত, এমনি করেই—]

সুব্রত বলল—শান্তনু আমি রুচিকে বিয়ে করতে চাই।

শান্তনু বলল—রুচি জানে ?

—জানে।

—কী বলে ও ?

—একটু ইতস্তত করছে। তবে সেটা—

—তবে আর ভাবনা কী ?

—ওর-ও, আমারও কেমন যেন মনে হল তোমাকে একবার বলা দরকার।

—রুচির বাবা-মাকে বলা হয়েছে ?

—সেই দায়িত্বটা তোমাকে একটু নিতে হবে।

—বেশ। নেওয়া যাবে। তবে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। সামনের মাসের মিড্‌ল-এ আমি বাইরে চলে যাচ্ছি, অনেক দিনের জন্য। তার আগেই বলতে হবে।

আস্তে আস্তে শান্তনু কথাগুলো উচ্চারণ করল।

—কেন ?

নিঃশব্দে শান্তনু এক্সরে ফটোটা এগিয়ে দিল। সুব্রতর চোখের সামনে শাদা হাড়-কখানার ছবি শুভ্র, নিরঞ্জন সত্যের মতো স্থির হয়ে রইল।

—কোন দিকটায় ?

—ডান দিকটায়। এই ক্যাভিটি।

—আঃ—

—ও কিছু নয়। জেনেছি বলেই কষ্ট। না জানলে পরম সুখ।

—রুচিকে বলব।

—বৃথা মন খারাপ করবে বেচারি। হেসে ফেলত আর একটু হলেই।

—এখনই তোমার অসুখ করল···স্বগতোক্তি করল সুব্রত। পর্দা দুলছে হাওয়ায়। সোডার ছিপি ফট করে খুলে যাচ্ছে। টল্‌টল্‌ করছে গ্লাস। খড়ের রঙের পানীয়—লাল নীল সবুজ বোতলের সরবৎ। কড়া চুরুটের গন্ধ। বেতারে হিন্দী গান। বয়দের ডাকাডাকি। বাইরে বাসের সতেজ গর্জন। রিকসার ভেঁপু। হাসির হৈ হৈ। বেণু আবার ছুটল। দু-হাতে দুটো মেয়ের হাত ধরে রহিস আদমি। মেয়ে দুটো বাঙালী। সোনার দাঁত চীনে সাহেব। পাইপ টানছে একমনে।

—আর বেশি দেরি নেই। পার্টি প্রকাশ্যে কাজ করবে। চারিদিকে নতুন দরজা খুলে যাবে। আবার আন্দোলনের জোয়ার আসবে। পার্টির নতুন লাইন, নানাদিকে নতুন সম্ভাবনা এনে দেবে। ফিল্ডে থাকার আকর্ষণ এখনই তো সবথেকে বেশি—শান্তনু—

শান্তনু বলল—আই ডু নট্‌ থিঙ্ক দ্যাট্‌ দে উইল সিং টু মি।

ওরা বহুক্ষণ বসেছিল সেদিন। সুব্রতর কেন যেন নিজেকেই বড় অপরাধী মনে হচ্ছিল। আর ও কেবলই নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল—আমি কেন নিজেকে দায়ী করতে চাই? রমেন মারা গেছে, প্রিয়ব্রত নন্দিনীকে নিয়ে চলে গেছে, শান্তনুর যক্ষ্মা হয়েছে—তাতে আমি কী করব? এমন কেন হয়, আমার বিবেকে বাধে কেন? সুব্রত বসে রইল বহু ইন্টারভিউতে ফেল-করা বেকারের মতো। আর দরখাস্ত করার ইচ্ছে নেই, সুপারিশ ধরার উৎসাহ নেই। ওর কেবলই মনে হতে লাগল কী একটা যেন না করলে কী একটা যেন হত না। কিন্তু সেটা যে কী তা তার নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। অবাধ্য একটা ক্রোধ শান্তনুর ওপর জমে উঠতে লাগল। আমি অপরাধী, আমারই শাস্তি পাওয়া উচিত, এই বোধ সত্ত্বেও বিচারকের বিরুদ্ধে যেমন ঘন হতে থাকে অনাস্থা।

আর শান্তনু সুব্রতর মৌনতায় পরম তৃপ্তি পেল। যেন চরম দণ্ড হানা গেছে। যেন ওর হাতে একটা শাস্তিদানের স্বাধীনতা ছিল সেটা সে ঠিকভাবে প্রয়োগ করেছে। নিষ্ঠুরের মতো মৃদু মৃদু হাসতে লাগল শান্তনু। চায়ের

জুড়িয়ে-যাওয়া তলানিটায় একটা বিস্বাদ চুমুক দিয়ে সে বলল, এবার উঠে পড়া যাক।

সুব্রতকে বাসে তুলে দিয়ে শান্তনু বাড়ির দিকে এগুলো। বুকের ফটোটা বুকের বাঁ-পাশের হাতের তলায় ধরে সে হাঁটতে লাগল। লাল লাল ডিমের ডালনা আর পাতলা ফিনফিনে পরোটার দোকান পেরিয়ে দেহব্যবসায়ী মেয়েগুলোর পাড়ার ভিতর দিয়ে ও হাঁটতে লাগল। রোগা চুপসে-যাওয়া মেয়েগুলো কিলবিল করে উঠছে। ভাঙ্গা মুখের আলোছায়ায় কোনো জটিলতা নেই। এ পাড়ায় ভিড় বেড়ে গেছে। আলো কম। এখানে অন্ধকার বেশি। খবর শোনা যাচ্ছে রেডিওয়—পরিকল্পনা, পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা।

কত পরিকল্পনা পেরুলে মমতাকে নিয়ে আসা যাবে সুস্থতায়—সেও গিয়ে দাঁড়াতে পারবে সেখানে? বেণুকে ডেকে নেওয়া যাবে? মমতা সেদিন বলেছিল—আপনি কিন্তু খুব ভালোলোক। এখন সে কী বলবে। 'কিন্তুর' জায়গায় হয়তো বসাবে 'তাহলেও' শব্দটা। সেটুকুই লাভ। শান্তনুর কষ্ট হল। কিন্তু সে কষ্টটাও মমতার কাণা আয়নাটার মতো। তাতে মুখ দেখা যায় না।

(ক্রমশ)

সিদ্ধেশ্বর সেন

একজন দিবারাতের কাণা।

> "Ah, close, Ah, close the Eyes of Nswspaper."
> —Mayakovsky

চোখ গেলে দাও, চোখ গেলে দাও, চোখ
গেলে দাও, দৈনিকের
'——পত্রিকা' খুলেছি

চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ—
বলে, পাখি

হায়, চোখ ঠিক্‌রে
উপ্‌ড়ে
নিলে বেলঘরিয়ায়

আমি যাই তো নিশিপোহালে কাজে, ফিরি
যে নিশিডাকলে

চোখ গেল, চোখ গেল, আমারই আত্মা
উড়ে এসে
বসেছে ট্রামের তারের আগায়

কর্নওয়ালিসে—
যানবাহন অচল
আর, ছোটে, এদিক-সেদিক ঢিলপাটকেল

পুলিশ কি কাজে এল আর গেল
আর,
পুলিশে কি কাজে আসে আর যায়, আর
পোড়ে যে ল্যাবরেটরি
গ্যাস-বার্নার নয়, একটা গোটা ল্যাবরেটরি

পাখি বলে, চোখ নেই
আর আত্মা বলে, চোখ
খুলতেও শিউরোই

নিউজ-প্রিন্টারে, ব্যানার-লাইনে, আমি,
কিছুই দেখি নি
ওরা কারা, রাউরকেলা, জামসেদপুর, কল্‌কাতায়, ওদিকে ঢাকায়,

বর্ডারে এপারে আর কে, কে
বর্ডারের ওপারে আরও কারা, কারা

পাখি বলে, আমার ডানা পুড়ছে
আমার আত্মা বলে, অন্ধ হলাম

জনপদ, দেশ, আমার কবিতা
সংসার-শুভশ্রী, এই শ্রেণী-
বোধ, মূল্য ও হৃদয়

হায়-হায় ক'রে
তারপর বলে
: সীসের অক্ষরগুলো দৈনিকে যা ছাপে
তার থেকে, নিজেকে, সরাও

সীসের অক্ষরগুলো কত em-এ সাজালে—
একটি সত্যের স্থান হয় !!

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

নীলকণ্ঠ

প্রাঙ্গনের সেই শিরীষশাখায় একটি পাখি ছিল চিরকালের সাথী, তার সঙ্গে সে নিয়ে আসত প্রত্যেকটি উজ্জ্বল প্রভাত, প্রতিটি নিবিড় সন্ধ্যার মেঘ। ক্ষুদ্র দুটি ডানার ঝাপটে হু হু করে ছুটে আসত উত্তরের শীতার্ত বাতাস, তার মৃদু হাস্যে ফুটে উঠত রঙবেরঙের ফুল, বসন্তের দীপ্তি নিয়ে ; কখনো বা তার তীব্র ক্রন্দনের যন্ত্রণায় অস্থির মেঘ ঢেলে দিত বারিধারা।

ঋতুচক্রের আবর্তনের মধ্যেই অবক্ষয়ের বীজ থেকে যায়, শাদা কার্পাসের গুচ্ছ যেমন বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়ায় নিরুদ্দেশের পানে ;
তেমনি একদিন সেই শিরীষগাছটাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ রোদসী
একটি মেয়ের মতো দেখালো। ম্লান রোদ্দুরে সেই রুগ্ন গাছটির
ব্যর্থ ছায়া কেমন ক্লান্ত হয়ে ঢলে পড়লো পূর্বগগনের উদ্দেশে।

সেই পাখিটি আর ফিরে এলো না তার অভ্যস্ত আবাসে। তীব্র
আর্তনাদে বারিধারা ছুটে এলো আকাশগঙ্গা মাথায় করে।
আর, নীলকণ্ঠের মতো শীর্ণ গাছটির রিক্ত গলায়
লেগে রইল শুদ্ধ একটু স্মৃতিসূত্রের বন্ধন॥

রাম বসু

কলকাতা ঃ খুলনা ঃ ১৯৬৪

শহরের মাথায় শকুনের মেঘ
কয়েকটা ঝলসানো মুখ, কিছু ধোঁয়া
গলির মুখে ইস্পাতের চকিত বিদ্যুৎ—
আমাকে আর তাকাতে বলো না
আমি পীড়িত, রক্তের কাদা আমার পায়।
আমাকে আর কথা বলতে বলো না
আমি ক্লান্ত, শব্দের কোরকে রক্তের গন্ধ।

ভীরুতার মধ্যে শঠতার মধ্যে আমাদের জন্ম
তাই আমরা বন্য পশুর চেয়েও বর্বর
হায় কলঙ্কিনী স্বাধীনতা,
হায় কল্লোলিনী গঙ্গা।

মুখগুলো সব হিংসার পতাকা
মহাজাগতিক বুদ্ধির আড়ালে প্রস্তর কংকাল
এক বর্ষায় সব কথার বাঁধ ভেসে গেল
আদর্শের আল দিয়ে খেত বাঁচানো গেল না আর
এখনও মানুষকে কত সহজে জন্তু করা যায়
হায় রাষ্ট্র! হায় রে ক্ষমতা!

পরাজিত সভ্যতা কবর খোড়ারও সময় পেল না
তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুন
আর মরা ডালে বসে সিন্ধুপারের শকুন
নখে অস্ত্র জড়িয়ে
পুরাণ কাহিনী শোনাচ্ছে।

মোহরের মা, পরাণের বৌ
আমি অন্ধ হয়ে গেছি
আমি বোবা হয়ে গেছি।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

এপার ওপারের ছড়া

এপার ওপার নামলো আঁধার চোখের কোলে কালি
কাটুম কুটুম বুদ্ধ, ভুতুম আলাই বালাই ষাট
চোরে চোরে মাসতুতো ভাই বাজালো হাততালি
মুখ থুবড়ে চাপড়ালো বুক ময়নামতির মাঠ।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে নেড়া মাথায় বেল
ধোঁয়ায় কালো দিন রাত্তির রক্তে ডাকে বান
কাঁধে জোয়াল রাঘব বোয়াল ভানুমতির খেল
ভুল বুঝে কেউ পরাণ কাড়ে কেউ বা কাড়ে জান।

বেনের ঘরে বিবেক বাঁধা অন্ধকারে পা
চোখের জলে বুক ভেসে যায় গণতন্ত্রের জন্যে
ল্যাজ উল্টে ডিগবাজি খায় রামগরুড়ের ছা
মুখে লাগাম বাজিয়ে সেলাম কেউ বাজারে হন্যে।

ভাঙা কুলোয় উলোটপালোট বাসি আথার ছাই
ঘাম ফেলে যায় উল্টোপথে গোটাকয়েক মাথা
সুতোর টানে ভেল্কি দেখায় মাসতুতো সব ভাই
ইতিহাসের অট্টহাসি উল্টিয়ে যায় পাতা।

এপার ওপার হাজার হাজার বিবেকে নির্ভর
আমির হোসেন সমর সেন আর অন্নদাশঙ্কর!

রত্নেশ্বর হাজরা

শর্ত

অগ্নি এখনও জীবনের শর্ত
জ্বালিয়ে দেয়, প্রকাশও দেয়,
কেউ নিজেকে, কেউ দুর্বলতাকে
জ্বালায়, তবু জীবনশর্ত
অগ্নিই হতে পারে—সত্যই হতে পারে।
বারবার বাক্‌চাতুরী বলেও কোনদিন
সত্যকে কেউ মিথ্যা বানাতে পারেনি।

এই সময়—এই দুরূহ সময়, যখন
পুষ্পের কথা বলা অপরাধ,
কপালে হাত দাও উত্তাপ পাবে
কেননা চৈতন্য এখনও জীবনশর্ত।
এবং এই চৈতন্য ভালোবাসাকে প্রেমে,
জ্ঞানকে প্রজ্ঞায় পৌঁছে দেয়।

আমরা গতির কাছে হাত পাতবো, উত্তাপের সঙ্গে সখ্যতায়
বুদ্ধিকে মানবতার মহত্ত্বে পৌঁছে দিতে দিতে
প্রতিটি দুর্যোগে নোয়া হয়ে যাবো, কেননা
ভয়হীনতার পদপ্রান্তে মৃত্যুও বিশ্বস্ত শিষ্যের মতো নতজানু।
তারপর একদিন প্রজ্ঞা ও প্রাণের হাত ধরে ধরে আমরা
মানবতার পথ পেরিয়ে জীবনের দিকে হেঁটে যাবো॥

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

উইল শেক্সপীয়র : একটি কল্পনা

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

প্রথম দৃশ্য

[প্রাসাদ সংলগ্ন একটি ঘর। এলিজাবেথ একটি টেবিলের পেছনে বসে, ঋজু চেহারা, হাতীর দাঁতের মতো রঙ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, চুলের রঙ ঘন লাল। বার্ধক্য ছাপ ফেলেছে চেহারায় কিন্তু সে প্রাচীন ওক গাছের মতো বার্ধক্য—নুয়ে ফেলতে পারেনি একটুও। চাল চলন মাপা, ভ্রূকুটি করেন প্রায়শই কিন্তু যখন হাসেন তখন সে হাসি স্নিগ্ধ। কণ্ঠস্বর ভারী, প্রায় কর্কশ কিন্তু পরিষ্কার। আভিজাত্যের ছাপ আছে চেহারায় কিন্তু মোটের ওপর জাগতিক বুদ্ধি, সাবলীলতার ছাপ নজরে পড়ে। পরণে সোনা ও দামী পাথরের কাজ করা গ্রীণ ব্রোকেডের পোশাক। রানীর পাশে হেন্‌স্‌লো—দশ বছর বয়স বেড়েছে, কিন্তু চেহারায় আরো সমৃদ্ধি ও আয়েসের ছাপ পড়েছে। এক কোণে হার্পসিকর্ড যন্ত্রের তারে আঙুল বোলাচ্ছে মেরী ফিটন। ২৬ বছর বয়স, এলিজাবেথের চেয়ে লম্বা, কালো চুল, হাসি-হাসি মুখ, উজ্জ্বল চোখ। চাল-চলনে বেড়ালের ক্ষিপ্রতা, কণ্ঠস্বর চাপা, মিষ্টি ও ভরাট। মেরীর পরণে কালো-সাদা সিল্কের পোশাক, গলায় মুক্তোর মালা, কানের কাছে বড় লাল গোলাপ গোঁজা রয়েছে।]

এলিজা : টাকা…টাকা…আর টাকা। হেন্‌স্‌লো, আমাকে তোমরা জোঁকের মত শুষছো—জনসাধারণ তোমাদের টাকা দিক…আমি আর পারব না।

হেন্‌স্‌ : জনসাধারণ তাদের পকেট খালি করে টাকা দেবে যদি আপনি একবার আপনার নাম ব্যবহার করতে দেন আমাদের।

এলিজা : না…না তোমাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হয় নি। এ পর্যন্ত কি দিয়েছ তোমরা! ভালো নাটক হয়তো অনেক করেছ কিন্তু স্পেন, ইটালির পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে এমন কোনো নাটক তোমাদের আছে? ট্যাসো, পেত্রার্ক, দান্তে—এদের পাশে দাঁড়াতে পারে এমন লোক কোথায় তোমার?

হেন্‌স্‌ : 'ফেয়ারী কুইন্‌'?

এলিজা : অসমাপ্তই পড়ে আছে?

হেন্‌স্‌ : লাইলি, গ্রীণ, পীল, কিড্‌—

এলিজা : ইংলণ্ডের লোকেদের ভালো লাগবে…কিন্তু গোটা পৃথিবীর সামনে দাঁড়াতে পারে ওরা? তোমরা নিজেদের মহারাণীর দল বলতে চাও—মুকুট চিহ্ন ব্যবহার করতে চাও তোমাদের থিয়েটারে! তাই সদলবলে দরবার করতে এসেছ! বেশ তো…ভালো নাটক দাও আমাকে—যে নাটক নিয়ে স্পেন,…ফ্রান্স…ইটালিকে টেক্কা দিতে পারি।

হেন্‌স্‌ : 'ট্যাম্‌বারলেন' রয়েছে!

এলিজা : বাচ্চারা মুগ্ধ হতে পারে—বড়রা কি পাবে ওতে?

হেন্‌স্‌ : 'ডক্টর ফস্টাস্‌'…'জ্যু অব মাল্টা'!

এলিজা : আমি জানি…আমি জানি এসব।

হেন্‌স্‌ : আরো ভালো জিনিস মার্লো দিতে পারে।

এলিজা : তুমি তাই বিশ্বাস কর, হেন্‌স্‌লো?

হেন্‌স্‌ : না মহারানী।

এলিজা : তাহলে আমাকে মিথ্যে কথা বল কেন?

হেন্‌স্‌ : মহারানী, আমি সময় নিচ্ছি—আমার লোক এখন তৈরি হচ্ছে।

এলিজা : আমার কাছে তুমি কতদিন আছো, হেন্‌স্‌লো?

হেন্‌স্‌ : বারো বছর।

এলিজা : এই বারো বছরে কবার আমার কাছে এসেছ?

হেন্‌স্‌ : চারবার মহারানী।

এলিজা : তোমাকে আমি সাহায্য করেছি না বাধা দিয়েছি?

হেন্‌স্‌ : আপনার দয়ায় আমাদের দিন-গুজরান হচ্ছে…একথা অস্বীকার করি কি করে?

এলিজা : তাহলে বল—কে তোমার লোক ?

হেন্‌স্ : আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না। এ পর্যন্ত সে প্রায় কিছুই করতে পারে নি—

এলিজা : কে সে ? শেক্সপীয়র ?

হেন্‌স্ : মহারানীর তো কিছুই অগোচর নেই। আপনি কথা বলবেন ওর সঙ্গে···শেক্সপীয়র, মার্লো এসেছে আমার সঙ্গে আপনার কাছে দরবার করতে।

এলিজা : হু···সেই স্ট্রাটফোর্ডের কিশোর ! আমি ভুলিনি ওর কথা।

হেন্‌স্ : কি প্রচণ্ড সম্ভাবনা নিয়েই না এসেছিল···সারা শহরটাকে হাসির হর্‌রায় মাতিয়ে তুলল একদিনে···। ব্যস্ ঐখানেই শেষ···আর ও কিছুই লিখবে না ! অথচ লিখলে ও কি না করতে পারত ! মহারানী, আমি উইলকে আবিষ্কার করেছিলাম···কেন জানি না ওকে আমি খুব স্নেহ করি। তো যখনই ওকে গম্ভীর ভাবে বোঝাতে যাই, হাসি দিয়ে ও আমাকে নিরস্ত্র করে ফেলে। হাসির বর্মে সর্বলোকের কাছে নিজের মনটাকে লুকিয়ে রেখেছে উইল।—

এলিজা : প্রত্যেক মেয়ের কাছেও ?

হেন্‌স্ : লোকে বলে—না, মহারানী—

এলিজা : আমাদের তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

হেন্‌স্ : (মেরী ফিটনের দিকে তাকিয়ে) সবাই বলে তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু রাজসভার একজন মহিলা আর একজন অভিনেতা ! নিছক পাগলামি ! মার্লো হলে ভাবনার কিছু ছিল না।—হাত পা ঝেড়ে শিস্ দিতে দিতে অন্যদিকে চলে যেত। কিন্তু উইল সব বিষয়েই একগুঁয়ে। যদি ওর বায়না থাকে খাবার পাতে চাঁদ পেড়ে দিতে হবে তবে তার অন্যথা নেই···বরং ও উপোস থাকবে তবু চাঁদ না হলে ওর খাওয়া রুচবে না।

এলিজা : তাহলে চাঁদের কাছেই নিয়ে যেতে হবে ওকে। মেরী !

মেরী : (উঠে ওদের কাছে এগিয়ে আসে) মহারানী ?

এলিজা : আমাদের কথা কিছু শুনেছ ?

মেরী : আমি ঐ নতুন স্বরটা বাজাচ্ছিলাম যেটা আর্ল আপনার জন্য রচনা করেছেন।

এলিজা : আমার জন্য ? যাক্, তুমি শুনেছ আমাদের কথা ?

মেরী : খুব সামান্যই শুনেছি !

এলিজা : তুমি তো প্রত্যেক নাটক দেখতে যাও। বলতে পারো আগামী দিনের নাট্যকার কে ?

মেরী : আমি মার্লোকে বেশি পছন্দ করি।

হেন্‌স্ : আপনার এরকম ধারণার যুক্তিটা কি ?

মেরী : যুক্তি খুব পরিষ্কার—শেক্সপীয়রকে আমি ভালোভাবে জানি। মার্লোকে আদৌ জানি না—আর আমি সবসময়ই নতুনের পূজারী, বৈচিত্র্যের সাধিকা।

এলিজা : শেক্সপীয়র কে ? সেই যুবকটি—সবসময়ে উৎসাহে টগবগ করছে ?

মেরী : আপনি যার কথা বলছেন সে মার্লো, শেক্সপীয়র অনেক সাধারণ—

হেন্‌স্ : সাধারণ ! হুঁ মার্লো হচ্ছে হাউইয়ের মতো—মুহূর্তের জন্য জ্বলে —সমস্ত আকাশ আলোয় উদ্ভাসিত করে দেয়। আর শেক্সপীয়রের চোখ-ধাঁধানো আলোর ছটা নেই···আছে ভোর রাতের শুকতারার মতো অচঞ্চল দীপ্তি।

এলিজা : আমি মনে করতে পারছি না ওকে কখনো দেখেছি কিনা।

হেন্‌স্ : শেক্সপীয়রকে একবার দেখলে ভোলা বড় কঠিন, মহারানী।— প্রশস্ত কপাল, তীক্ষ্ণ টিকোলো নাক···চাপা ঠোঁট···আজানুলম্বিত বাহু···চোখে বিদ্যুতের ধার অথচ কি গভীর বেদনা···

এলিজা : হেন্‌স্‌লো ! আমি শেক্সপীয়রকে দেখতে চাই—মার্লো···অন্য কোনো সময়—।

হেন্‌স্ : আমি এক্ষুণি ওকে মহারানীর সামনে হাজির করছি।

[হেন্‌স্‌লো বেরিয়ে যায়]

এলিজা : মেরী, এ-কাজ তোমার মেরী !

মেরী : মহারানী ! আমাকে নিষ্কৃতি দিন ! এ যন্ত্র পুরনো···আর বেসুরে বাঁধা।

এলিজা : নতুন সুর লাগাও।

মেরী : আপনার তাই ইচ্ছে, মহারানী ?

এলিজা : হ্যাঁ, আমার তাই ইচ্ছে। মার্লো অপেক্ষা করুক—আর পেমব্রোকও।

মেরী : মহারানী !

এলিজা : নতুন সুর যতক্ষণ বাজাচ্ছ আমি কিছুই বলব না। কিন্তু পেমব্রোকের আর্লকে আয়ার্ল্যাণ্ডে চলে যেতে হবে। মনে রেখ ভালো জামাকাপড় পরিয়ে রাজসভা আলো করার জন্য তোমাদের আমি রাখি নি। পাশের ঘরে স্পেন আর ফ্রান্সের রাজদূতেরা জরুরী খবর নিয়ে অপেক্ষা করছে—আমি কি কয়েকজন অভিনেতার সঙ্গে শুধু হাসি ঠাট্টা করে সময় কাটাব ?

মেরী : সত্যি ; আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিলাম, আপনি ওদের সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলছেন !

এলিজা : অবাক হচ্ছ তুমি ? মেরী ! আমি যা করি তা কেন করি... বুঝলে তুমিই ইংলণ্ডেশ্বরী হতে ! কাজের কথা বলি।—শেক্সপীয়র একজন সামান্য অভিনেতা ; কিন্তু ওর মনের রাজ্যের বিস্তার অনেক ...সেই রাজ্যের শাসনভার তোমার হাতে দিলাম। শুধু একটা কথা মনে রেখ—আমার ইচ্ছা তোমার অজানা নয়, সেই বুঝে চোলো। আমার ইচ্ছে উপেক্ষা করে আরেক মেরীকে অন্তর্ধান হতে হয়েছিল !

মেরী : অভয় দেন তো বলি—আপনার শাসন পদ্ধতি আমার ভালো জানা নেই—

এলিজা : নাবালিকা ! তুমি কি ভাব আমার পদ্ধতিতে তুমি শাসন করতে পারবে ? আচ্ছা, নিজের পথেই চল। কিন্তু একসঙ্গে একের অধিক রাজ্যে লোভ কোরো না !

[এলিজাবেথ বেরিয়ে যান]

মেরী : (টেবিলের ধারে বসে পা দোলাতে থাকে) হুঁ ! পেমব্রোক তাহলে আয়ারল্যাণ্ডে চলল ! আবার শুরু হল নিরানন্দ বিস্বাদ জীবন ! ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করতে পারব।...শেক্সপীয়র...উইল শেক্সপীয়র...দেখি আমার অলস সময় ও ভরাতে পারে কিনা ! —মার্লো হলে বেশ হত।...“সামান্য অভিনেতা, কিন্তু ওর মনের রাজ্যের বিস্তার অনেক”—দেখা যাক (শেক্সপীয়র ঢোকে) আহা ! বেচারী মিঃ শেক্সপীয়র ! রানীর সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখা পেলেন—

শেক্স : রানীর !

মেরী : চুপ ! প্রাসাদের দেওয়ালেরও কান আছে। তারপর, কি খবর ?

শেক্স : ভালো, খারাপ আর অর্থহীন।

মেরী : খারাপটা দিয়েই শুরু হোক্।

শেক্স : খারাপ ?—গত পাঁচ সপ্তাহ তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি ! ভালো—গত পাঁচ সেকেণ্ড ধরে তোমায় দেখছি ! অর্থহীন—আগামী পাঁচ বছর আমাকে না দেখলেও তোমার কিছু আসবে যাবে না !

মেরী : এত কথা তোমায় কে বলল, বুদ্ধির সাগর ?

শেক্স : আমি কোনো উত্তর পাই নি—

মেরী : পাঁচটা চিঠির আর সাতটা সনেটের।

শেক্স : ‘প্রেমের পরিশ্রম দণ্ড’।

মেরী : সত্যি। ঐ নাটকটায় পরিশ্রম বেশি, প্রেম কম।

শেক্স : ঠিক বলেছ তুমি, আমার আর একটা নাটক লেখা উচিত।

মেরী : হ্যাঁ, সনেট লেখার চেয়ে বেশি উপকার পেতে তাতে।

শেক্স : আমার সনেট তুমি পড় ?

মেরী : পড়ি আর হাসি।

শেক্স : হাস কেন ? আমার জগতে তুমি আসতে চাও না।—এলে দেখতে পেতে রূপ-রঙের কি অবিরাম লীলা চলছে সেখানে।

মেরী : খোলো তোমার হৃদয়-দুয়ার—দেখাও সেই জগৎ আমাকে।

শেক্স : আমার স্বপ্নলোকের চাবি চুরি গেছে।

মেরী : আমার চাবির গোছায় আর হাজারটা চাবির মাঝে কি তার হদিশ মিলবে ?

শেক্স : আর হাজারটা চাবি ?—তাহলে ওরা যা বলে—

মেরী : ওরা যা বলে ? ওরা কি বলে ?—পেমব্রোক্ ?

শেক্স : ওরা মিথ্যে কথা বলে ! আমি বিশ্বাস করিনে ওদের রটনা।

মেরী : কি আশ্চর্য ! পুরুষমানুষ অথচ ঈর্ষা নেই ! এ আমার নতুন অভিজ্ঞতা !—এ আমার নতুন অভিজ্ঞতা ! এ আমার সইবে না !—

শেক্স : আমি তোমায় ভালোবাসি—

মেরী : আচ্ছা ?

শেক্স : আমি তোমায় ভালোবাসি—

মেরী : ব্যস্ ?

শেক্স : আমি তোমায় খুব ভালোবাসি।

মেরী : সে তো কোনো নতুন কথা নয়—সবাই বলে।

শেক্স : তুমি হাসছ। আমি সত্যি কথা বলছি।

মেরী : সবাই সত্যি কথা বলে। যে ফিরিওয়ালা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে 'ভালো গোলাপ,' সে কি তা বিশ্বাস করে না। গোলাপের আর প্রেমের সওদা যারাই করে বিশ্বাস করে বলেই তো এত চিৎকার করে।

শেক্স : আমার বেসাতি হাটের জন্য নয়। আমি বিক্রি করি না।

মেরী : ফিরিওয়ালা! আমি প্রায় কিনতে যাচ্ছিলাম।

শেক্স : মেরী! আমি বিকি-কিনির কারবার করিনে—দেওয়া নেওয়ার পশারী আমি।

মেরী : যদি নিতে রাজী হই ; কি দেবে তুমি আমায়।

শেক্স : স্বপ্নলোকের হদিশ।—সে এক রূপকথার দেশ—বসন্ত যেখান থেকে কোনোদিন বিদায় নেয় না—পথের ধারে নাম-না-জানা ফুলের মেলা বসে প্রতিদিন—গোধূলির সোনালী আলোয় পথ খুঁজে পরীরা নামে হাজার তারার পাপড়ি ছড়াতে ছড়াতে—আমাকে জানলে, আমাকে চিনলে সেই পরীর ঠিকানা পাবে তুমি!

মেরী : আমি তোমাকে ভালো করেই চিনি। তুমি 'রোজ' থিয়েটারের অলস মিঃ শেক্সপীয়র। পরীর দেশেই শুধু তোমার আনাগোনা। তাই হাল্কা ; দায়িত্বহীন মিলনান্ত নাটক ছাড়া আর কিছু তুমি পার না। কিন্তু আমি রক্ত মাংসের মানুষ—পরীর দেশের ছেলে-খেলায় আমার মন ভরবে না।

শেক্স : আচ্ছা, আমি তোমাকে দেখাব।

মেরী : কি দেখাবে তুমি আমায় ?

শেক্স : প্রেমের এক নতুন পৃথিবী—আর সেই পৃথিবীতে তুমি আর আমি।—ইটালীর এক প্রেমিকযুগলের কাহিনী পড়েছিলাম বহুদিন আগে—সেই মেয়েটি ঠিক তোমার মতো—আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা—আগুনের রং নিয়ে তাদের প্রেমের মশাল জলে উঠল—তারপর হঠাৎ মৃত্যু—

মেরী : মৃত্যু!

শেক্স : হ্যাঁ। তারা মরে গেল—জলন্ত মশাল জলে ডোবালে যেমন মুহূর্তে মিলায় তার দীপ্তি, তেমনি হঠাৎ!—অত গভীর প্রেম কি এই পৃথিবীতে বাঁচে ?

মেরী : লিখে ফেল উইল, লিখে ফেল। পারবে তুমি লিখতে ?

শেক্স : রোমিওকে আমি জানি। জুলিয়েটকে চেনাও তুমি।

মেরী : আমি পারব ? নিশ্চয় পারব আমি।

শেক্স : বেচারী জুলিয়েট।

মেরী : না…না…বেচারী কেন সে হতে যাবে! মনে রেখো উইল, তাকে যেন কেউ করুণা না করতে পারে। আর মনে রেখো—

শেক্স : কি ?

মেরী : আজ নয়, আজ নয়…অন্য কোনোদিন—কাণে কাণে তোমায় বলব. আমার গোপন কথা…। ওঃ। কি একখানা নাটক হবে! তুমি লিখবে তো উইল ?—আমার জন্য…আমার জন্য লিখবে, না ? আচ্ছা, কোথায় থাকত ওরা ?

শেক্স : ভেরোনায়—ইটালির এক নগরে।

মেরী : আমার কাছে রোজ আসবে তুমি, উইল—শোনাবে কি, কি কি লিখলে…বেশিদিন লাগবে ?

শেক্স : লাগতে দেব না।

মেরী : কি নাম দেবে নাটকটির ?—'বিচিত্র প্রেম ?'—'ভেরোনার প্রেমিক যুগল' ?—

শেক্স : না, না! অনাড়ম্বর নাম দুটি শুধু পাশাপাশি—'রোমিও আর জুলিয়েট।'

[পরস্পর কাছে ঝুঁকে কথা বলতে থাকে, তখন—]

—পর্দা—

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

['রোমিও এণ্ড জুলিয়েট' অভিনয়ের প্রথম রজনী : চতুর্থ অঙ্কের শেষ দিক অভিনীত হচ্ছে। পর্দা উঠলে দেখা যাবে ছোট্ট প্রায় আসবাবহীন অফিস ঘর, থিয়েটারের জিনিসপত্র পোশাক ইত্যাদি এলোমেলো ছড়ানো। যতক্ষণ ব্যাক্স্টেজের দরজা খোলা থাকছে ততক্ষণ পেছনে পর্দা, ইতস্তত লোকজন ঘুরে বেড়ানো, টর্চের আলো ইত্যাদি দেখা যাবে। দূর থেকে ভেসে আসা গুঞ্জন সব সময় শোনা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে প্রশংসার কলধ্বনি ভেসে আসছে। পর্দা উঠলে দেখা যাবে মেরী পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে, উইল মেরীকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে।]

মেরী : যেতে দাও! আমায় যেতে দাও! এই অঙ্কের পর্দা পড়ার আগেই আমাকে গিয়ে বসতে হবে।—মহারানী কি বলেন শুনব।

শেক্স : তুমি আবার ফিরে আসছ তো ?

মেরী : সেটা নির্ভর করছে মহারানী কি বলেন তার ওপর। উনি যদি নাটক পছন্দ না করেন আমার কাছে কিছুই আশা কোরো না।

[আবার প্রশংসাধ্বনি শোনা যাচ্ছে]

শেক্স : শুনতে পাচ্ছ ? নাটক জমছে না মনে হচ্ছে ?

মেরী : ও তো সাধারণ লোকেরা চেঁচাচ্ছে। মহারাণীর প্রশংসার ওপর তোমার নাটকের ভাগ্য নির্ভর করছে।

শেক্স : তোমার নাটক !

মেরী : সত্যি আমার নাটক ?

শেক্স : আমার সত্য : তোমার নাটক। মেরী ! একটা জিনিস চাইব ?

মেরী : ও ! তাহলে নিঃশর্ত উপহার নয় ?

শেক্স : একটু ধন্যবাদ অন্তত দিয়ে যাও আমাকে !

মেরী : আগাম ? উঁহু ! আমি মহারানীর বাঁদী। উনি যদি একবার তালি দেন তো আমি দেব হাজারবার···উনি যদি ওঁর হাত এগিয়ে দেন চুম্বন করার জন্য—তাহলে আমি এগিয়ে দেব—ওই যে···পর্দা নেমে গেছে—আমি চললাম।

শেক্স : মেরী !

মেরী : ওই শোন···হাজার মেরীর থেকে ওর দাম বেশি।

[মেরী বেরিয়ে যায়, দরজা খোলা থাকে। অবিরাম উচ্চ করতালি ধ্বনি হতে থাকে।]

শেক্স : সাফল্যের সোনার আপেল এতদিনে হাতে এল আমার ! এর স্বাদ কি মিষ্টি ? কে জানে···দশ বছর আকুল আগ্রহে এই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করেছি···দশটি বসন্তের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে শুধু স্বপ্ন দেখেছি···আজ এল সেই আকাঙ্খিত দিন···আমার নাটক দেখছে ওই হাজার হাজার লোক···ওরা কাঁদছে, হাসছে—আমার কথায়···কিন্তু কই আমার তো কোনো পরিবর্তন হয় নি। —সাধারণ মানুষ আমি—উইল শেক্সপীয়র—কি আশ্চর্য !

স্টেজবয় : (দরজার ফাঁকে শুধু মাথা ঢুকিয়ে) আপনি তো কারো সঙ্গে দেখা করবেন না ?

শেক্স : না, নাটক শেষ হলে আমি গ্রীণরুমে যাব। তার আগে কাউকে এনো না আমার কাছে।

স্টেজবয় : আমিও তাই বললাম ঐ মেয়েলোকটাকে। তা সে ঘ্যানর-ঘ্যানর করছে তো করছেই। বলছে ওর অপেক্ষা করার সময় নেই আর আপনি নাকি ওকে চেনেন—চলে যেতে বলে দিই তাহলে ?

শেক্স : কোনো নাম বলে নি ?

স্টেজবয় : কি হ্যাথাওয়ে যেন ! স্ট্রাটফোর্ড থেকে এসেছে।

শেক্স : অ্যান্ ! এখানে নিয়ে এস ! তাড়াতাড়ি···আমাকে আগে বলনি কেন ? আচ্ছা কেউ ওকে দেখেছে কি ? চুপিচুপি ডেকে নিয়ে এস এখানে···আর শোনো···মার্লো আর হেন্স্লো ছাড়া কেউ খোঁজ করলে বলবে আমি বেরিয়ে গেছি। দাঁড়িয়ে আছ কেন ? তাড়াতাড়ি যাও।

স্টেজবয় : বাঁচা গেল ! আধঘণ্টা ধরে পথের মধ্যিখানে বসে আছে, কিছুতেই নড়ছে না। (ডাকে) এদিকে এস···আহা···এইদিকে (বেরিয়ে যায়)

শেক্স : অ্যান্ ? অ্যান্ লণ্ডনে ? কি করছে ও লণ্ডনে ?

[মিসেস্ হ্যাথাওয়ে ঢোকেন]

শেক্স : একি ? অ্যান্ নয় ?

মিঃ হ্যাথ : মিঃ শেক্সপীয়র—? উইল! উইল তুমি!

শেক্স : দশ বছর পরে মানুষ অনেক বদলায়।

মিঃ হ্যাথ : কিন্তু আমার মতো বুড়ি দশ বছরে বদলায় না। আমি সেই অ্যানের মা।

শেক্স : সেটুকু মনে থাকবে না। এতটা বদলাই নি আমি। আপনি কেন এসেছেন আমার কাছে বলুন ?

মিঃ হ্যাথ : খবর এনেছি তোমার জন্য।

শেক্স : সুখবর ?

মিঃ হ্যাথ : ভালো কি মন্দ নির্ভর করবে তোমার ওপর।

শেক্স : মারা গেছে ?

মিঃ হ্যাথ : তাই হলে কি ভালো খবর হত ? না, বাছা, সে সৌভাগ্য ওর কপালে নেই।

শেক্স : আমি সে কথা বলিনি! ও কি আপনার সঙ্গে এসেছে ?

মিঃ হ্যাথ : না।

শেক্স : ও পাঠিয়েছে আপনাকে ? ও, আমি বুঝেছি—আমার সাফল্যের কথা শুনে সৌভাগ্যের ভাগ নিতে পাঠিয়েছে আপনাকে!

মিঃ হ্যাথ : ছিঃ···ছিঃ···ছিঃ! এমন কথা তুমি ভাবতে পারলে ? অ্যান্ তোমার কোনো কথাই জানে না, ওই কালো মেয়েটির কথাও না।

শেক্স : কি বলছেন আপনি ?

মিঃ হ্যাথ : আমি দেখেছি ওকে—আপন মনে বিভোর হয়ে এ ঘর থেকে বেরুতে। ওর মুখে খুশির ছাপ দেখতে আমার ভুল হয় নি। ওকে খুশি করতে চাও কর। আমি বুড়ো মানুষ—আমি লোককে বিচার করি না! যাক্ আমার খবরের সঙ্গে এ সবের কোনো সম্পর্ক নেই।

শেক্স : আজকের রাত আর পাঁচটা রাতের মতো নয়—এর ওপর আমার ভাগ্য নির্ভর করছে। আজ আমার সময় হবে না—কাল আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।

মিঃ হ্যাথ : কাল আমার খবর বাসি হয়ে যাবে।

শেক্স : ভালোই তো—আমায় শুনতে হবে না।

মিঃ হ্যাথ : তুমি কি বলছ তুমি জান না।

শেক্স : আমি খুব ভালো করেই জানি আমি কি বলছি। অ্যানের কোনো খবরে আমার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই! ওর যদি টাকার প্রয়োজন থাকে, পাঠিয়ে দেব—আজ রাতে আমি অনেক টাকার মালিক হব।

মিঃ হ্যাথ : আজ তুমি বড়লোক হতে পার···কিন্তু আমার কথা না শুনলে কাল তুমি কত গরীব হয়ে যেতে পার তুমি জান না।

[কলধ্বনি ফেটে পড়ে]

শেক্স : আপনার কথা শুনব ? কেন ? আপনি কি ওর থেকে ভালো কিছু আমায় শোনাতে পারেন ?

মিঃ হ্যাথ : কিন্তু অ্যান্ যদি পারে ? উইল, আমার এই ষাট বছরের অভিজ্ঞতা দিয়েও বুঝতে পারি না কেমন করে মানুষ নিজের রক্তমাংসের সন্তানের চেয়ে কাজকে বড় করে দেখে!

শেক্স : আমিও কি জানি না শুধু কাজ নিয়ে থাকা কত দুঃসহ হয়ে উঠতে পারে! কিন্তু সংসারের ওই ছোট্ট কোণটুকুতে আমার কোনো অধিকার নেই। আপনি জানেন না কেমন করে আমি দিন কাটাই···সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে যখন ঘরে ফিরি তখন কোনো ফুটফুটে বাচ্চা আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে না···কিন্তু রাতের অন্ধকারে ; ঘুমের ঘোরে বাচ্চার দল ভিড় করে আসে আমার চার পাশে···আদর করে হাত বাড়িয়ে যখন ওদের কাছে টেনে নিতে যাই তখন ওরা মিলিয়ে যায়···

মিঃ হ্যাথ : অ্যান্ তবে ঠিকই বলেছিল—ও বলেছিল তুমি কোনো খবরই রাখ না। উইল, তুমি চলে আসার দু-মাস পরেই অ্যানের কোল জুড়ে হ্যামনেট আসে—তোমার ছেলে।

শেক্স : এ কথা সত্যি নয়।

মিঃ হ্যাথ : আঃ, অ্যান্ ঠিকই বলেছিল। ও বলেছিল খবর পাঠালেও তুমি বিশ্বাস করবে না···তার চেয়ে হ্যামনেট যখন বড় হবে তখন তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবে এই ছিল ওর ইচ্ছে। আহা, ওর সে ইচ্ছে বুঝি মিথ্যে হয়ে গেল। আমার সোনার হ্যামনেট গত

শনিবার থেকে…জ্বরের ঘোরে…অচেতন…। তাই আন্
পাঠিয়েছে তোমাকে খবর দেবার জন্যে।

শেক্স : নতুন কৌশল—

মিঃ হ্যাথ : তুমি আসবে না ?

শেক্স : না, আমি যাব না।

মিঃ হ্যাথ : তোমার ছেলে তোমার জন্য কাঁদছে আর তুমি—

শেক্স : মিথ্যে কথা। ও ওর বাবাকে চেনে না।

মিঃ হ্যাথ : তুমি জান না উইল, হ্যামনেটের কাছে তুমি কি ? কেউ ওকে কিছু বললে কচি ঠোঁট ফুলিয়ে বলবে, "বাবা এলে বলে দেব, আমায় বকেছ"…জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে, আর থেকে থেকে বলছে "আমার বাবা আসবে…আমায় চাঁদটা এনে দেবে"…

শেক্স : আমি যাব।

একটি লোকের কণ্ঠস্বর : (স্টেজের পেছন থেকে) শেক্সপীয়র! উইল শেক্সপীয়র! শেক্সপীয়রকে ডাক!

শেক্স : (মিসেস্ হ্যাথাওয়েকে) শুনুন! আমাদের কখন যেতে হবে ?

মিঃ হ্যাথ : ঘোড়ার গাড়ি সরাইখানায় অপেক্ষা করছে।

কণ্ঠস্বর : শেক্সপীয়র!

শেক্স : আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিন। ঠিক রাত বারোটায় আমি লণ্ডন ব্রীজের ওপর অপেক্ষা করব।

মিঃ হ্যাথ : দেরী কোরো না যেন…তাহলে হয়তো বাছাকে আমার আর দেখতে পাবে না।

শেক্স : আপনি কি ভেবেছেন আমি এত বড় পশু ? যদি আমি জানতাম তাহলে হয়তো আমি…যদি আমি জানতাম অন্যায় সহ্য করার এ কি রীতি মেয়েদের! ও কি আমাকে আর একটু আগে খবর পাঠাতে পারত না ? আমি কি এত নৃশংস যে মরতে বসার আগে ছেলের খবর আমাকে পাঠান হয় নি। এ কখনো হতে পারে না…আমি বলছি হ্যামনেট মরবে না—ওকে বাঁচতেই হবে। নিজের ছেলের জন্য আমি যমের সঙ্গে লড়াই করতে পারব না ? দেখি…দেখি…যতক্ষণ না সোনার হ্যামনেটকে আমি দেখছি ততক্ষণ কেমন করে মরণ আসে ওর কাছে ?

মার্লোর কণ্ঠস্বর : শেক্সপীয়র! মহারানী তোমার খোঁজ করছেন। উইল! উইল!

শেক্স : ঠিক মাঝরাতে তাহলে!

[মিসেস্ হ্যাথাওয়ে বেরিয়ে যান]

কণ্ঠস্বর : উইল! শেক্সপীয়র!

শেক্স : আসছি! আসছি!

মেরী : (দরজা দিয়ে ঢোকে, পেছনে মার্লো) আচ্ছা শেক্সপীয়র কোথায় ?

শেক্স : ওঃ এখন নয়, এখন নয়, এখন নয়!

মেরী : তুমি কি পাগল হলে উইল! মহারানী তোমার জন্য সৌভাগ্যের ডালি সাজিয়ে বসে আছেন…আর তুমি এখানে চুপ করে বসে আছ ? ওঁর ফরমাস গ্রীষ্মোৎসবের জন্য নাটক লিখে দিতে হবে। যাও তাড়াতাড়ি যাও—পঞ্চম অঙ্ক শুরু হল বলে! যাও (শেক্সপীয়র বেরিয়ে যায়) দেখ কি রকম ধীরে ধীরে যাচ্ছে!—হাতের লক্ষ্মী এমন করে পায়ে ঠেলতে আছে!

মার্লো : লক্ষ্মী ও পেছনে ফেলে গেছে।

মেরী : এ দেখি আর এক কথার জাদুকর!—আপনিই কি মিঃ মার্লো ?

মার্লো : আপনিই কি মেরী ফিটন ?

মেরী : আমি আপনার কথা শুনেছি।

মার্লো : আমিও শুনেছি আপনার কথা। আপনি কি শুনেছেন আমার সম্পর্কে ?

মেরী : শুনেছি, আপনি নাকি উইলের শিল্প-সুবাদে ভাই। আমার কথা কি শুনেছেন ; এবার বলুন।

মার্লো : আপনি নাকি ওর শিল্পসুবাদে বোন হন!

মেরী : বোন ?—বড় ভিজে…ঠাণ্ডা সম্পর্ক! তা কি বলে উইল তার বোনের সম্পর্কে ?

মার্লো : বলে, আপনি ওর ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন!

মেরী : যে ভাগ্যকে ও আজ ফিরিয়ে দিচ্ছে!

স্টেজহ্যাণ্ড : (প্যাসেজের ভেতর থেকে) শেষ অঙ্কের অভিনয় শুরু হচ্ছে—আস্তে—আস্তে—

মেরী : আমি দেখব—চললাম।

মার্লো : আপনি জানেন না নাটকটা ?

মেরী : সবটা। কিন্তু ভগ্নীস্নেহ দিয়ে দেখতে চাই।

মার্লো : আর একটু থেকে যান না !

মেরী : যতক্ষণ না উইল ফিরে আসে ? তাহলে আমার আর কিছুই দেখা হবে না—ও আমাকে আটকে রাখবে।

মার্লো : আপনার খারাপ লাগলেও ?

মেরী : না, আমার ভালো লাগবে বলেই।

মার্লো : কি ভালো লাগে আপনার ? উইলকে না ওর নাটক ?

মেরী : সঠিক জানি না।

মার্লো : আমি যদি উইল হতাম কোনো দ্বিধা রাখতে দিতাম না।

মেরী : আচ্ছা !—কেমন করে ?

মার্লো : এখানে এই ব্যস্ততায় বলা যাবে না—আর পর্দা উঠে গেছে।

মেরী : আসবেন একদিন আমার বাড়ি—বলবেন।

মার্লো : ওকি ? একটা কিছু গোলমাল হচ্ছে, মনে হচ্ছে।

হেন্‌স্‌ : (বাইরে থেকে) শেক্সপীয়র ! উইল ! (ভেতরে ঢোকে) সর্বনাশ হয়েছে ! উইল কোথায় ? ওর গ্রীণরুমে থাকার কথা ! কি করি আমি এখন ? শেক্সপীয়র কোথায় ?

মেরী : মহারানীর সঙ্গে কথা বলছে।

মার্লো : পর্দা উঠে গেছে—এক্ষুনি আসবে।

মেরী : কি হয়েছে ?

হেন্‌স্‌ : কি হয় নি ? জুলিয়েট ! সব পাঁঠার দল—কফিন সুদ্ধ জুলিয়েটকে ফেলে দিয়েছে—বেচারা যন্ত্রণায় চিৎকার করছে—বলছে ও আর স্টেজে নামতে পারবে না ! শেষের অংশটুকু আমি বাদ দিয়ে দিতে বলছি !

মার্লো : হাড়-টাড় ভেঙেছে নাকি !

হেন্‌স্‌ : তাই মনে হচ্ছে।

মেরী : ওকে বল মরে গেলেও ওকে অভিনয় শেষ করতে হবে—শেষটুকু বাদ গেলে সমস্ত নাটকটা নষ্ট হয়ে যাবে ! অসম্ভব !

হেন্‌স্‌ : ও সত্যিই পারবে না।

মার্লো : একস্ট্রা যে লোকটা ছিল ?

হেন্‌স্‌ : প্যারিসের পার্ট করছে। শেক্সপীয়র কোথায় গেল ? আমি এখন কি করি ?

মার্লো : উইল প্রচণ্ড আঘাত পাবে।

মেরী : না, উইল আঘাত পাবে না ! এ আমাদের দুজনের নাটক ! হেন্‌স্‌লো ; জুলিয়েটের গা থেকে পোষাক খুলে নিয়ে এসো, আমি জুলিয়েট করব। যাও—

হেন্‌স্‌ : কি ? মেয়েলোক স্টেজে অভিনয় করবে ?

মেরী : হ্যা, পুরুষেরা যখন পারবে না ! যাও ! আমি বলছি আমি জুলিয়েট করবই !

শেক্স : (ভেতরে ঢোকে) শুনেছ ? শুনেছ তোমরা ?

মেরী : (বেরিয়ে যেতে যেতে) শুনেছি ! তোমার জুলিয়েট তুমি পাবে। এ নাটক বন্ধ হবে না !

[মেরী ও হেন্‌স্‌লো বেরিয়ে যায়]

মার্লো : ওর কি জুলিয়েটের পার্ট জানা ?

শেক্স : প্রতিটি লাইন ; প্রতিটি শব্দ ! এ জুলিয়েট তো ওরই সৃষ্টি।

মার্লো : কিন্তু অভিনয় ? অভিনয় করতে পারবে ও ?

শেক্স : মেরী ? যাও গিয়ে দেখ।

মার্লো : তবু ! অভিনয় ! অভিনয় করা কি এত সহজ ?

শেক্স : অনর্থক সন্দেহ করছ ; কতটুকু জান তুমি মেরীকে ?

মার্লো : তুমি ওকে পুরো চেনো, বন্ধু ?

শেক্স : আমি ওকে স্বপ্ন দেখি !

মার্লো : তোমার স্বপ্ন দীর্ঘস্থায়ী হোক।

শেক্স : মার্লো, আমার স্বপ্নের দিন অতীত--সামনে শুধু কালো ছায়া।

মার্লো : কি হয়েছে ? কোন দুঃসংবাদ ?

শেক্স : হ্যাঁ, স্ট্রাটফোর্ড থেকে। কিট্ কিট্ ! ভাবো দশ বছরের নিস্তব্ধতার পর ঠিক আজকের দিনটিতেই !

মার্লো : স্ট্রাটফোর্ড ! ওঃ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কি চান সেই মহিলা।

শেক্স : চুপ। শুনতে পাচ্ছ—মেরীর অভিনয় !

মার্লো : খুব মিষ্টি গলা তো !

শেক্স : কিট্ ! পৃথিবীতে কোথায় শান্তি আছে বলতে পার ?

মার্লো : শান্তি ?

শেক্স : হ্যাঁ ! সুখের দিন কেন আসে মানুষের জীবনে যদি ব্যর্থতায় তার পরিণতি ঘটে ? কেন এত বেদনা—এত অনিশ্চয়—

মার্লো : আমি শান্তিতে থাকতে চাই না। এই অনিশ্চয়—এই ব্যর্থতা—এই ধুলো, কালি, মাটি—আমার ভালো লাগে প্রতিমুহূর্তে লড়াই করতে জীবনের সঙ্গে !

স্টেজহ্যাণ্ড : (ভেতরে ঢোকে) মিঃ হেন্‌স্‌লো আপনাদের ডাকছেন। ওঃ কি নাটক। এত উত্তেজনা আমি আমার দশ বছরের চাকরীতে কোনো নাটকে দেখি নি ! আপনারা আসবেন না !

শেক্স : মার্লো, তুমি যাও।

স্টেজহ্যাণ্ড : ভয়ের কিছু নেই—সব ঠিক চলছে—জুলিয়েট কি সুন্দর মারা গেল—কে বলবে যে একজন মেয়ে—ওই শুনুন লোকেরা পাগল হয়ে উঠেছে ! আপনারা চলুন !

মার্লো : ঠিক আছে ; তুমি যাও, আমরা এক্ষুণি যাচ্ছি। (লোকটি বেরিয়ে যায়)

শেক্স : আমি যেতে পারব না ! তুমি যাও ! বল আমি নেই, মরে গেছি—যা খুশি বলে দাও ওদের ! আমি আর পারছি না !

মার্লো : তুমি কি পাগল ? মেরী ঠিকই বলেছিল—হাতের লক্ষী পায়ে ঠেলছ তুমি।

শেক্স : তুমি জান না—ভাগ্যলক্ষী আমাকে নিয়ে কি নিষ্ঠুর খেলা খেলছেন ! যাও…যাও—ওদের বল ; আমি চলে গেছি—সত্যিই আমি চলে যাব মেরীর সঙ্গে একবার দেখা করে।

মার্লো : সত্যি ? অনেক দিনের জন্য ?

শেক্স : অনেক দিন বা অল্প দিন—কি আসে যায় তাতে। আমার পরম লগ্ন আমি হারিয়েছি—এরকম মুহূর্ত দুবার আসে না মানুষের জীবনে !

মার্লো : তুমি কি মেরীকে বলবে কেন যাচ্ছ !

শেক্স : মেরীকে ? পাগল ?

কণ্ঠস্বর : শেক্সপীয়র ! শেক্সপীয়র !

শেক্স : শুনতে পাচ্ছ ? যাও…যাও। বল আমি চলে গেছি ! আঃ যাও— !

মার্লো : বেশ, তোমার যা ইচ্ছে !

[মার্লো পেছনের দরজা অল্প খোলা রেখে বেরিয়ে যায়। চিৎকার, করতালি ধ্বনি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। সিন শিফটারদের চেঁচামেচি, নির্দেশ শোনা যায়। আস্তে আস্তে তাও থেমে যায়। নেমে আসে গভীর স্তব্ধতা]

শেক্স : আমার ইচ্ছে ! আমার ইচ্ছে ! তুমিও বুঝলে না মার্লো আমার মনে কী ভীষণ ঝড় উঠেছে ! কী আশ্চর্য সৃষ্টি এই মানুষ—কত কাছাকাছি অথচ কত দূরে—একটা গোটা জীবন কেটে যায় তবু কেউ কাউকে বোঝে না !…শুনেছি কোনো মেয়ে নাকি পারে হৃদয়রহস্যের কিনারা করতে—সহজেই পেয়ে যায় অতল মনের হদিস…কিন্তু আমি এসব কি ভাবছি ?—কেন ভাবছি ?—আমার নৌকো অন্য ঘাটে বাঁধা, যতই চাই নড়বার উপায় নেই !

[দ্রুত পদধ্বনি : মেরী জুলিয়েটের পোশাকে ঢোকে। দরজার কাছে আবেগবিহ্বল মুখে দু-হাত মেলে আবাহনের ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। ওর পেছনে দরজা সশব্দে বন্ধ হয়, ব্যাক-স্টেজের সব গোলমাল থামিয়ে দেয়]

মেরী : ওঃ, কি বিচিত্র জগৎ আজ তুমি আমাকে দেখালে উইল। হাজার হাজার চোখ মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিল আমাকে—দেখছিল প্রেমের দীপ্তদহনে আমার মৃত্যু ! প্রেমময় ! সত্যি প্রেমে আমার মরণ ঘটাও। তোমার প্রেমে আমায় ধন্য কর—সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে দাও আমাকে।

শেক্স : মেরী ! মেরী !

মেরী : এ কী ঝড় তুলেছ তুমি…যে ঝড় আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে—থামতে দিচ্ছে না। কেন আমায় এমন আচ্ছন্ন করলে। সুরের জাদুকর, সুধা-রবে আমাকে জাগাও, আমার বহু রজনীর শূন্যতা ভরিয়ে তোলো তোমার প্রেমে—মিলন শতদলে তোমার প্রেমের অরূপমূর্তি দেখাও আমাকে।

শেক্স : এই দুটি হাত এর আগে কোনোদিন প্রেমের অর্ঘ্য নিয়ে আসে নি—অধরের এই সুধাপাত্র এত কাছে। বহু সাধনার আকাঙ্ক্ষিত লগ্ন এলো আজ। হে স্রষ্টা! লক্ষ যুগের পরিশ্রমে প্রথম যেদিন ফুলের গুচ্ছ ফুটেছিল, তোমার হৃদয় কি সেদিন এমনি দুরু দুরু কেঁপেছিল?

মেরী : এস, কাছে এস।

শেক্স : কি নিস্তব্ধ দেখছ চারপাশ! কেন জান? ঈশ্বর অবাক হয়ে দেখছেন আমাদের দুজনকে—আমরা দুজনে স্বর্গ রচনা করেছি এই ছোট্ট ঘরে—

অ্যানের কণ্ঠস্বর : এই ছোট্ট ঘরের চার দেওয়ালের মাঝে আমার ইচ্ছেগুলো ঘুরপাক খেয়ে মরে—

শেক্স : কে? কে?

মেরী : কই? কেউ নেই তো এখানে।

শেক্স : কিন্তু আমি যে শুনলাম কে যেন চিৎকার করে উঠল—(চিৎকার করে) ঐ, ঐ—বাচ্চা ছেলের কান্না!

মেরী : ভুলে যাও সব। আমার কাছে এস।

শেক্স : নাও আমাকে—তোমার কালো চুলের অরণ্যে আমায় আচ্ছন্ন করে দাও। আজ রাতে বসন্তকে শেষ-বিদায় জানাব আমি—তারপর—রাত কত হল?

মেরী : মাঝ রাত পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

শেক্স : ওঃ, আমার জীবন চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হয়ে গেল।

মেরী : আমি তোমার পাশে—যদি এ জীবন অভিশপ্তও হয় তাহলেও কি সুন্দর নয় এই জীবন?

শেক্স : কত সুন্দর ঈশ্বরও বুঝি জানেন না।

মেরী : সুন্দর! এসো তোমার ছন্দ, তোমার সুর নিয়ে—নন্দিত কর আমাকে। তোমার চেতনার রঙে আমাকে রাঙিয়ে দাও। তোমার মাঝে আমায় নিবিড় করে নাও।

শেক্স : আমার সবই নিয়েছ তুমি—এবার আমাকে নাও!

মেরী : (আলিঙ্গন করে) এস!

পর্দা

(ক্রমশ)

সুরঞ্জন সান্যাল

শব্দ-কথা প্রসঙ্গে

কাব্য-সাহিত্যে বিজাতীয় শব্দের সংক্রাম কেবল চসর কেন, স্বয়ং কালিদাস পর্যন্ত এড়াতে পারেন নি। আসলে এ'কথা অন্তত ইদানীং প্রমাণিত যে উপলক্ষ যাই হোক, দু'টি ভাষার মানুষ যখন উভয়ের নিকটবর্তী হয় তারা ভাষা-ঘটিত ব্যাপারে পরস্পরকে প্রভাবিত করে। কদাচ কখনো উন্নত-অবনত ভাষার দ্বৈরথে অবনতকে উদ্বর্তনের তাগিদে বাক্-রীতিতে ও শব্দে উন্নতের প্রভাবকে মান্য করতে হয়। চতুর্থ শতকীয় বাইবেলের অনুবাদে বুলফিলার গ্রীসীয় বাক্-রীতিতে গথিককে ঢেলে সাজানো তারই দৃষ্টান্ত, অথবা বাঙলার ক্ষেত্রে ইংরিজির অনতিক্রমনীয় প্রভাব ঐতিহাসিক বলেই স্বীকার্য। তবে বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় যত না প্রকরণ ঘটিত (phonetics, morphology, syntax ইত্যাদি) ব্যাপারে, তার চেয়ে বেশি শব্দের পরিগ্রহণে।[১]

স্বয়ংবশ ভাষা সাধারণত রক্ষণশীল। অর্থাৎ নিজস্ব ধাতু শব্দ প্রত্যয় সহযোগে সে ভাষা প্রয়োজনীয় শব্দ সৃষ্টি করে নিতে পারে, খুব কমই নতুন শব্দের জন্য অন্য ভাষার দ্বারস্থ হয়। তথাপি স্বয়ংবশ ভাষাতেও যে বিজাতীয় শব্দ পরিগ্রহণের দৃষ্টান্ত নেই, তা' নয়। গ্রীক বা সংস্কৃতে গ্রীক, ঈরাণীয় বা দ্রাবিড় অষ্ট্রিক, সেমীয় শব্দও অপ্রতুল নয়। সংস্কৃতে গৃহীত 'কেন্দ্র' (গ্রী-kentron), 'সুরঙ্গ' (গ্রী Surinx), 'পুস্তক' (পো-পোস্ত্)[২] অনার্য (দ্রাবিড়-অষ্ট্রিক) মূল কজ্জল, তাম্বুল, নগর, সর্ষপ, অরণি,[৩] সেমীয় 'ক্রমেলক'[৪] প্রভৃতি বিজাতীয় হলেও কোন একসময়ে অপরিহার্য বিবেচিত হয়েছিল। গ্রীকেও 'ব্রাখমানেস্' (সং-ব্রাহ্মন), 'মাস্‌থোস্' (সং-মুষ্ক)[৫] প্রভৃতি সংস্কৃত-মূল শব্দ ছাড়াও সেমীয় ঈরাণীয় ভাষার বহুশব্দ স্বীকৃত (naturalised) হয়ে গেছে। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিজাতীয় শব্দের এইরকম পরিগ্রহণ অল্পবিস্তর সবভাষাতেই বিদ্যমান। বলাই বাহুল্য, এর পশ্চাতে রয়েছে, দেশে দেশে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের লুপ্ত ইতিহাস।

ইংরিজি পশ্চিম-জরমানিক ভাষার রূপভেদে উৎপন্ন। জরমান-যদিচ স্বয়ংবশ ভাষার চারিত্র্য বহন করে, তথাপি জরমান যা পারে অর্থাৎ নিজস্ব ধাতু প্রত্যয়-যোগে প্রয়োজনীয় শব্দ সৃষ্টি করে নেওয়া, ইংরিজি তা পারে না। নতুন শব্দের জন্য ইংরিজিকে তাই বিজাতীয় ভাষার দ্বারস্থ হতে হয়। এই কারণেই আজ সহস্র সহস্র ল্যাটিন ও ল্যাটিন-জাত ফরাসী শব্দ ইংরিজির শব্দ ভাণ্ডারে স্থান লাভ করেছে। এ ছাড়া শত শত গ্রীক, ইতালীয়, স্পেনীয় এবং য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষার তথা পৃথিবীর সকল ভাষার শব্দই ইংরিজি আত্মসাৎ করেছে। অর্থাৎ ইংরিজি আজ পরবশ, borrowing language-ফলত সর্বগ্রাসী। ভাষার নিজের ওপর আস্থা কমে গেলে সাধারণত এইরকম ঘটে। ইংরিজিরও তাই ঘটেছিল বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে। সে-কারণে উচ্চকোটির শব্দের জন্য ইংরিজি গ্রীক ল্যাটিনের দ্বারস্থ হয়েছে, তথাপি নিজে শব্দ সৃষ্টি করে নেয় নি।[৬] যেমন, ইংরিজি যেখানে ব্যবহার করে (ল্যাটিন) Century সেখানে (ইংরিজির নিকট জ্ঞাতি) জরমানে শতবাচক Jhar-hundret (বিশুদ্ধ ইংরিজিতে হলে year-hundred-শত-অব্দ); ইংরিজির (গ্রীক) telephone, জরমানে Fern-Sprecher (বিশুদ্ধ ইংরিজিতে Far-Spaker—দূরভাষ) রূপে ব্যবহৃত হয়।[৭]

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে ইংরিজি সকল ভাষার শব্দই অল্প বিস্তর গ্রহণ করেছে। ভারতীয় ভাষার বহু শব্দও আজ ইংরিজিতে চলছে। যেমন, bunglow, cheroot, Lac, Juggernaut, pundit, avatar, curry[৮] প্রভৃতি বাঙলা হিন্দুস্থানী তামিল ভাষা থেকে সোজাসুজি ইংরিজিতে গৃহীত হয়েছে।[৯] কিন্তু এ'সব শব্দ ছাড়াও ইংরিজিতে এমন শব্দ একাধিক আছে যা সোজাসুজি নয়, বিচিত্র পথ-পরিক্রমা করে, বিভিন্ন ভাষার নিজস্ব উচ্চারণ বিধির চাপে রূপান্তরিত হয়ে ইংরিজিতে জায়গা পেয়েছে বিভিন্ন শতকে।[১০]

যেমন, (১) Sandal < চন্দন (সংস্কৃত)। শব্দটি প্রথমে সেমীয় ভাষা-সম্পৃক্ত আরবীতে 'সন্দল' রূপে গৃহীত হয়। আরবী থেকে ল্যাটিনে শব্দটি রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ায় Sandalum (তুঃ গ্রী, Sandalion), তারপর ইংরিজিতে Sandal রূপে স্থান লাভ করে।

(২) Sugar < শর্করা (সং)। প্রাচীন আরবীতে শব্দটি Sakkar (তুঃ ফা 'শকর') ল্যাটিনে Zuccar, প্রাচীন ফরাসীতে Sukere-এ রূপান্তরিত হয়ে মধ্য-ইংরিজি স্তরে Sugar রূপে গৃহীত হয়। 'শর্করা' শব্দটি গ্রীকে

গৃহীত হয় 'সাক্খারোন (Saccharion) রূপে, তা' থেকে ল্যাটিনের মধ্য দিয়ে ইংরিজিতে Saccharion শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে। ইংরিজি Sugar-candy শব্দের মূলেও সংস্কৃত 'শর্করা খণ্ড' (তুঃ ফা শকর কন্দ') শব্দটি আছে।

(৩) Ivory < ইভরদ্ (সং)। 'ইভ (হস্তী)+রদ (দন্ত)+ইয় (প্রত্যয়)' শব্দের মধ্য ভারতীয় আর্যাভাষা স্তরে রূপ হয় 'ইভরিয়'।[১১] ল্যাটিনে শব্দটি হয় ebur (eboreus), সেখান থেকে প্রাচীন ফরাসীতে Yvoire এবং মধ্য ইংরিজিতে শব্দটি Ivory রূপে স্থান লাভ করে।

(৪) Ginger < শৃঙ্গবের (সং)।[১২] 'শৃঙ্গ (শিং)+বের (দেহ অর্থাৎ আকৃতি, 'আদার' শৃঙ্গ সদৃশ আকৃতি বলে ?)। শব্দটি গ্রীকে 'জিঙ্গিবেরিস্' (Zingiberis), সেখান থেকে ল্যাটিনে 'জিঙ্গিবার' (Zingiber) এবং মধ্য ইংরিজিতে গৃহীত হয় Ginger রূপে।[১৩]

(৫) Brinjal < বাতিঙ্গন (সং)। শব্দটি পোর্তুগীজে পাওয়া যায় ব্রিঞ্জেলা (bringella) রূপে (তুঃ স্পে, berengana)। পোর্তুগীজ থেকে শব্দটি ইংরিজিতে হয় brinjal। সং-'বীতিঙ্গন' পারসীকে 'বাদিন্-গান্',—সম্ভবত আদি ইন্দো-ঈরাণীয় কোন একটি শব্দের দুই রূপভেদ।

(৬) Jackal < শৃগাল (সং)। শব্দটি পারসীকে রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ায় Shagal (শগাল), তুর্কীতে হয় chaqal (চকাল), এবং তুর্কী থেকে শব্দটি ইংরিজিতে স্থান লাভ করে Jackal রূপে।

(৭) Tamarind < তিন্তিড় সং। শব্দটি পারসীকে 'তমর' Tamar (—i—hind='সিন্ধু'-শব্দের বিকারে), আরবীতে রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ায় Tamr-hindi (Sour fruit of India), স্পেনীয়তে Tamarindo, ইংরিজি Tamarind।[১৪]

(৮) Rice < ব্রীহিঃ (সং) তামিলে arichi অরিচি (তুঃ আফগানী Vrize), গ্রীক ও ল্যাটিনে aruzu এবং arizum রূপে স্থান লাভ করে। প্রাঃ ফরাসীতে শব্দটি riz, এবং মধ্য ইংরিজিতে rys > rice-এ রূপান্তরিত হয়।[১৫]

(৯) Panther < পুণ্ডরীকঃ (সং)। শব্দটি গ্রীক (Panther), ল্যাটিন (Panthera) ও প্রাঃ ফরাসীর (Panthere) মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে মধ্য ইংরিজিতে Panther রূপ লাভ করে।

(১০) Sapphire < শনিপ্রিয়স্ (সং)। প্রথমে হিব্রুতে শব্দটি (Sappir) গৃহীত হয়। হিব্রু থেকে শব্দটি গ্রীক (Sappheiros), ল্যাটিন (Sapphirus)

ও ফরাসীর (Saphir) মধ্য দিয়ে মধ্য ইংরিজিতে Sapphire রূপে স্থান পায়।

(১০) Beryl<বৈদূর্য (সং)। 'বৈদূর্য' মধ্য-ভারতীয়-আর্য ভাষায় হয় 'বেলুরিয়'। উক্ত শব্দটি গ্রীক ও ল্যাটিনে যথাক্রমে berullos এবং beryllus রূপে গৃহীত হয়। ল্যাটিন থেকে ইংরিজিতে হয় Beryl (মূল্যবান পাথর)।[১৬]

যদিচ উচ্চভাবের নয়, তথাপি বিভিন্ন বস্তুবাচক শব্দের নাম হিসাবে উল্লিখিত শব্দগুলি সংস্কৃত থেকে বিভিন্ন প্রাচীন ও মর্যাদাবান ভাষার নিজস্ব উচ্চারণ-বিধির চাপে রূপান্তরিত হয়ে যে ভাবে ইংরিজিতে স্থান লাভ করেছে, তা' নিঃসন্দেহে ভাষাতাত্ত্বিক কৌতূহলের বিষয়। শব্দগুলির বিবর্তনের স্বরে নানা দিগ্‌দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের লুপ্ত ইতিবৃত্ত ঐতিহাসিকের অনুসন্ধিৎসা জাগাক বা না জাগাক, ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এ'সব শব্দের ব্যুৎপত্তি ও বিবর্তনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সে ক্ষেত্রে উপার্জিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই ভাষাতাত্ত্বিকের একমাত্র সহায়। কাল্পনিকতায় নিষ্ঠাও স্বীকার্য বটে, কিন্তু তা' কদাচ নৈরাজ্য প্রতিরোধী।[১৭]

---

১. Maris Pei : The Story of Laaguage, p. 128.

২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, পৃঃ ১১১।

৩. T. Burrow : Sanskrit Language (Ch. 'Non-Aryan Influence' etc) pp 373-88.

৪. 'ক্রমেলক' শব্দটি (সংস্কৃতে 'উষ্ট্র' শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও) কালিদাস প্রথম ব্যবহার করেন তাঁর 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে ('কেলিবনং প্রবেশ্য ক্রমেলক : কণ্টক ভাজনেষু' ch 1.29)। চসরের রচনাতেও nadir, zenith প্রভৃতি সেমীয় শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্যাপারটি এই কথাই প্রমাণ করে যে কবিরা ভাবানুষঙ্গের প্রবর্তনায় দেশী-বিদেশী কোন শব্দকেই অবহেলা করেন না। সেখানে একমাত্র মানদণ্ড বোধহয় ভাষার প্রাসঙ্গিকতা (দ্রঃ Skeat : Etymological Dictionary of English Language (EDEL) এবং M. Williams : Sanskrit-English Dictionary (SED)। সেমিয় (হিব্রু) Gamal শব্দটি একদিকে যেমন 'ক্রমেলক', অন্যদিকে তেমনি ইংরিজি Camel শব্দেরও মূল)

৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভারত সংস্কৃতি, পৃঃ ৩৬

৬. ঐ ঐ ভাঃ প্রঃ বাঙলা ব্যাকরণ ('ব্যাকরণের তুলনা') ১৯৪২, পৃঃ ৫১৮। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইংরিজির মত ভারতীয় ভাষাগুলিও অর্থাৎ বাঙলা তামিল হিন্দী প্রভৃতিও পরবশ। প্রয়োজনে তাদেরও আজ অন্যভাষার দ্বারস্থ হতে হয়। উক্ত ভাষাগুলির শব্দভাণ্ডারের হদিস যাঁরা রাখেন, তাঁদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার।

৭. Century প্রভৃতির জরমান প্রতিশব্দ আসলে এক ধরণের translation loan. বিজাতীয় শব্দের অর্থের অনুসরণে আপন ধাতুপ্রত্যয় সহযোগে শব্দ গঠন। যেমন, বাঙলাতেও ব্যবহৃত হয় স্বর্ণ যুগ (golden age), পাদপ্রদীপ (foot light) ইত্যাদি (দ্রঃ সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১৪৯)। যাই হোক স্বয়ংবশ জরমান ভাষায় এ ব্যাপারকে বিজাতীয় প্রভাব বলা যেতে পারে।

৮. তামিল curry শব্দের অর্থ 'সব্‌জী'। বাঙলায় উক্ত অর্থে 'তরকারি' শব্দটি চলে। 'তরকারি'র মূলে আছে ফারসী তরহ্‌ (সব্‌জী) + কারি। দু'টি পরস্পর অসম্পৃক্ত অথচ সমার্থক শব্দ মিলিত হয়ে বাঙলায় (একই অর্থে) নতুন একটি শব্দ সৃষ্টি করেছে।

৯. S. Rao : Indian Words in English (App.) p. 100.

১০. 'A loan word may have a long history and travel over long distances' (E. H. Sturtevant : An Introduction to the Linguistic Science, p. 144)

১১. B. C. Majumdar : History of Bengali Language (HBL), 1920. p. 250

১২. (ক) ভাষাবিদ্ Zule মনে করেন 'শৃঙ্গবের' শব্দের মূলে সমার্থক (দ্রাবিড়) inchi (root) + ver, 'ইঞ্চিবের' শব্দটি বিদ্যমান। 'শৃঙ্গবের' শব্দের উৎপত্তি উক্ত শব্দের বিকারে। (খ) ধ্বনি-পরিবর্তনের সহযোগে শব্দার্থ পরিবর্তনের কৌতুকাবহ উদাহরণ 'শৃঙ্গবের' থেকে (১) জাঞ্জিবার (দ্বীপের নাম) (২) স্পেনীয় Dengue (ন্যাকামি-অর্থে) > বাং 'ডেঙ্গু' (রোগ) প্রভৃতি শব্দগুলির উৎপত্তিতে (দ্রঃ ভাষার ইতিবৃত্ত (পাদটীকা) পৃঃ ৪৩)।

১৩. EDEL (Skeat) এবং SED (M. Williams)

১৪. HBL (Majumdar), p 250.

১৫. Tamil Lexicon (vol. 1) ও EDEL (Skeat)

১৬. অনুরূপ : ইং peper < সং-পিপ্পলি ; camphor < সং-কর্পূর ; opal < সং-উপল ; গ্রীক ও ল্যাটিনের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। (দ্রঃ EDEL (Skeat), Hobson-Jobson (yule) ও SED (M. Williams)

১৭. পৃথিবীর তাবৎ প্রাচীন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধানেই শব্দের ব্যুৎপত্তিঘটিত আলোচনায় বহু ভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা, অস্পষ্টতা, অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরণগুলিতে বহু বিদেশী ও অজ্ঞাতমূল শব্দের সংস্কৃতরীতিতে ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'ময়ূর' শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'মহ্যাং রৌতীতি (মহী + রু) মহীতে ডাকে বলে 'ময়ূর' (কাশিকা দ্রঃ)] অথচ 'ময়ূর' সংস্কৃতে গৃহীত অস্ট্রিক ভাষার শব্দ। হিব্রু পৃথিবীর সকল ভাষার জনক এমন ধারণাও তো দীর্ঘকাল য়ুরোপে প্রচলিত ছিল (দ্রঃ Barfield : History in English Words, p. 15) অবশ্য তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের জন্ম মাত্র এক শতকের ঘটনা।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

পোস্টার

সামনের দেয়ালে আবার একখানা পোস্টার পড়েছে। রাস্তা দিয়ে কত লোক যায়। কেউ কেউ পড়ে দেখে। কেউ দেখেও দেখে না। কারো বা নজরেও পড়ে না। তবু আমাদের এই ফ্ল্যাট বাড়িটার মুখোমুখী রাস্তার ওপারের ঐ দেয়ালের গায় দু'চার দিন পর পর পোস্টার মারে। কে বা কারা মারে জানি না। জানবার চেষ্টাও করি না। ছা-পোষা কেরানী। কে যায় যত সব হাঙ্গামা হুজ্জতের নেপথ্যের কথা জানতে? যার খুশি মারুক, যার ভাল লাগে পড়ুক।

তবু না পড়ে পারি না। এত কাছে, একেবারে মুখোমুখী, তাই। আমার দোতলার শোবার ঘরের মধ্যে থেকে গোটা দেয়ালটা চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য, রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ি না কখনো। নরম নিরীহ পোস্টার!

সরবরাহ মন্ত্রী বলেন, কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়াছে। তবে কাপড়ের দাম কমে না কেন? কেন কমে না সে কথা ভাবতে ভাবতে নিচে নেমে যাই। রোজ সকালে চা খাওয়ার পরে রাস্তার দিকে রকে গিয়ে বসি। পাশের বাড়ির অধ্যাপক পরেশবাবু আসেন তার ইংরেজী সংবাদপত্রখানা সংগে করে। আমারই পাশের ফ্ল্যাটের ইন্‌কাম-ট্যাক্স আপিসের ধনঞ্জয়বাবু আসেন তার দশ বছরের প্রিয় বাংলা খবরের কাগজখানি নিয়ে।

"দত্ত মজুমদারের খাটালের দেয়ালটা দস্তুরমতো একটা সংবাদপত্র হয়ে দাঁড়াল।"

"তাই তো দেখছি।" ধনঞ্জয়বাবুর পরিহাসের জবাবে বললাম, "ইদানীং একটু বেশী রকম বাড়ছে খবরের সংখ্যা।"

সংবাদপত্র থেকে মুখ তুলে অধ্যাপক পরেশবাবু বলে উঠলেন "এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? হালে খবরের কাগজওয়ালারা নীতি বদলেছেন: ঘটে যাহা সব সত্য নয়। তাই পছন্দসই খবর না হলে—তা সে যত বড় অঘটনই

হোক না কেন—আজকাল তা সংবাদপত্রে অপাঙক্তেয়। ফলে এক ঘরে খবরগুলো ঠাঁই নিচ্ছে দেয়ালে দেয়ালে।"

"যাই বলুন ওসব পোস্টার ফোস্টার মেরে কিছু হয় না।" ধনঞ্জয়বাবু গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করেন, "কী লাভ হয় এতে? কজন লোক পড়ে মশায়?"

"শত হলেও খবরের কাগজ!" বললাম, "ছাপার হরফের একটা যাদু আছে যেন!"

"হ্যাঁ, একেবারে বেদবাক্য—তা সে যত বড় মিথ্যাই ছাপা হোক না কেন।" অধ্যাপক ফোড়ন কাটেন।

শুনে খুসি হই না। অধ্যাপকের মতামত মাঝে মাঝে একটু উগ্র হয়ে ওঠে। তবু আমাদের বন্ধুত্বে কখনো টান পড়ে না। তাঁর সঙ্গে একটা জায়গায় আমাদের দু'জনের স্বভাবের মিল আছে। গোলযোগের গন্ধ পেলে তিনিও দূর দূর দিয়ে গা বাঁচিয়ে চলেন।

ধনঞ্জয়বাবু না বলে পারলেন না, "আপনি তো বক্তৃতার ঝোঁকে অনেক কথাই বললেন। বিপদের কথাটা একবার ভেবে দেখেছেন?"

"এতে আমাদের ভয় পাবার কী আছে মশায়?" অধ্যাপক প্রশ্ন করেন।

"কে বলতে পারে হঠাৎ একদিন সার্চ টার্চ হবে কিনা। অনর্থক হয়রানী কে চায় মশায়! আমাদের এই বাড়িটাতে ছেলে ছোকরা—তা আট দশজন তো হবেই। ধরে নিয়ে গেলেই হল। আজকাল কি আর আইনটাইন আছে!"

চেয়ে দেখি মই বেয়ে উঠে পোস্টার লাগাচ্ছে দেয়ালে—সিনেমা কোম্পানীর নতুন ছবির সচিত্র বিজ্ঞাপন। "কন্‌ট্রোল তুলে দেবার পর তিন মাসে কাপড়ের কলওয়ালারা একশো কোটি টাকা মুনাফা লুটেছে।" দু' তিন দিন আগের সেই বড় বড় হরফের পোস্টারটাকে একেবারে ঢেকে দিল ভারতবিখ্যাত চিত্রতারকার তিন রঙা আবক্ষমূর্তি।

পরদিনই আবার একখানা। এবার পরোক্ষ কায়দার এক উপভোগ্য পোস্টার: পুরোদমে চোরা কারবার চালাও। "ক্ষমতা হাতে পেলেই চোরা কারবারীদের ফাঁসি দেব"—পণ্ডিত জওহরলাল। এক বছরে ক'জন ধরা পড়েছে? মাভৈ নিখিল চোরাকারবার সমিতি।

যথাসময়ে রকের আড্ডায় এসে বসেছি। অধ্যাপক সহাস্যে বললেন,

"পোস্টারওয়ালারা দেখছি নতুন টেকনিকের খেলা দেখাতে সুরু করল। আজ লোক টানছে মন্দ নয়।" দেয়ালের কাছে ছোটখাটো ভীড় জমেছে। বেশীক্ষণ নয়। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে লোক থামে, দেয়ালের কাছে এগিয়ে যায়। পড়ে, হাসে, টীকাটিপ্পনীও করে।

খানিক বাদে ধনঞ্জয়বাবু এসেই জানালেন, "শুনেছেন তো?"

"কী?"

"যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই। এ পাড়ায় টিকটিকির আনাগোনা সুরু হয়েছে।"

"মানে?"

"কাল দুপুরের দিকে আশপাশের দোকানগুলোর লোকজনদের তারা—সি-আই-ডি'র লোকই হবে—বিস্তর জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে। রসুল মিঞাকে নাকি শাসিয়ে গেছে—বলে গেছে নজর রাখতে।"

আমাদের এ-বাড়ীরই গায়ে লাগানো রসুল মিঞার বিড়ির দোকান। হাঁক দেই। রসুল হাতের কাজ ফেলে রেখে চলে আসে।

"কাল নাকি পাড়ায় পুলিশের লোক এসেছিল?"

"মালুম নেহি।"

"তোমার দোকানে হে"—ধনঞ্জয়বাবু জোর দিয়ে বলেন।

"নেহি তো বাবু"।

এবার প্রশ্ন করেন পরেশবাবু "ও সব পোস্টার কারা লাগায় জানো? তুমি তো সব সময় সামনেই থাকো।"

"ম্যয় তো হর-বকৃত কাম পরহি রহতা হুঁ বাবু। ঔর বাংলা জবান তো মুঝে মালুম নেহি হোতে হায়।"

"আরে বাংলা বাত হিন্দী বাতের কথা হচ্ছে না।" ধনঞ্জয়বাবু প্রায় রুখে উঠেন, "দিন দুপুরে ও সব কারা এসে মেরে যায় তুমি তার কিছুই জানো না বলতে চাও?"

"কুছ কুছ দেখতা হুঁ। কভি বাবু লোক লাগাতে হে, কভি মজদুর লোক ভি লাগাতে হে।"

রসুল চলে যেতেই অধ্যাপক বললেন, যাই বলুন না, লোকে ওসব পড়তে চায়। দেখছেন তো এত পোস্টার পড়ছে, কৈ ছিঁড়ে ফেলছে না তো কেউ।"

দেয়ালের কাছে আবার একটা ছোট্ট ভীড় জমেছে।

দিন চারেক বাদে। একখানা বড় আকারের তথ্যভারী নীরস পোস্টার: পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী জানাইয়াছেন, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা বেতন পান ও নয় হাজার টাকা ভাতা পান। এ ছাড়া তাঁহার মস্কোর অফিসের জন্য ব্যয় হয় বৎসরে ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। এ টাকা কার? তোমার—আমার—কোটি কোটি ভারতবাসীর।

ধনঞ্জয়বাবু দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন—পড়ছেন না। পড়ছে জনকয়েক পথচারী: কারখানায় যাবার পথে শশব্যস্ত শ্রমিক, রেশনের থলে হাতে চশমা-পরা কেরানী ভদ্রলোক, এক রাজ্যের সংবাদপত্র বগলদাবা করে এক ছোকরা বয়েসী হকার। ধনঞ্জয়বাবু শঙ্কা প্রকাশ করেন, "এবার নিশ্চয় পুলিশের উৎপাত সুরু হবে। বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

"কেন? নতুন খবর তো কিছু দিচ্ছে না। এসব ফ্যাক্টস্ ফীগারস্ তো সেদিন খবরের কাগজেই পড়েছি।"

তা হলে কী হয়। খবরের কাগজ কী আর এ সব খবর এমন করে চোখে অঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।"

"তা বটে।"

অধ্যাপক দেয়ালের দিকে চেয়ে আছেন। বললাম, "কী ভাবছেন পরেশবাবু?"

"ভাবছি—রোলস্ রয়েস্ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন এ বুলক্-কার্ট কানট্রি।" একটু হেসে বললেন অধ্যাপক, "এ উক্তি করেছিলেন সেকালের এক মডারেট নেতা। তিনি আজ ফিরে এলে নিশ্চয় এক্সট্রিমিষ্ট লেবর লীডার বলে স্পেশাল পাওয়ার্স এ্যাক্ট-এর বেড়াজালে পড়বেন।"

ধনঞ্জয়বাবু এক টিপ নস্যি নিতে নিতে সেদিনের মতো আবার জোর অভিমত জানান, "এতে কোনো লাভ হয় না। ক'জন লোক পড়ে এ সব? আর পড়েই বা হচ্ছে কী?"

"কী হয় না-হয় জানিনে। তবে আপাতত আমার পনেরো বছরের ছেলেটার মগজে কিঞ্চিৎ শ্লোগানের ধোঁয়া ঢুকেছে।" পরেশবাবু হেসে বলেন।

আমার বড় ছেলেটাও ঐ বয়েসী। সুতরাং উৎকর্ণ হয়ে শুনে যাই।

—"গেল মাসে আমাদের ঠিক-ঝি সাতদিন কামাই করেছে। বলে অসুখ করেছিল। আমার তা বিশ্বাস হয়নি। হিসেব করে এ মাসে সাতদিনের মাইনে

কম দিয়েছি বলে আমার পুত্র তার মায়ের কাছে নাকি মন্তব্য করেছে, বাবার বড়ো পেটি বুর্জোয়া মেণ্টালিটি।"

"বলবেন না আর।" বলছেন এবার ধনঞ্জয়বাবু, "আমার কনিষ্ঠ সহোদরের বড় বড় কথার ঠেলায় গায় জ্বালা ধরে। ইদিকে কলেজের পড়া তো সিকেয় উঠেছে। সেদিন বই নিয়ে গুন্‌গুন্ করছে। একটু পরখ করলাম, বলতো স্টক্ আর শেয়ারে তফাৎ কী? বলে কী না ও সব কথা তোমরা জানবে— আমাদের জন্যে নয়। ভবিষ্যতে স্টক এক্‌চেঞ্জই থাকবে না, তার আর স্টক্ আর শেয়ারে তফাৎ।"

পরেশবাবু আর আমি একসঙ্গে হেসে উঠি। হাসেন ধনঞ্জয়বাবুও, কিন্তু পরক্ষণেই যেন একটু গম্ভীর হয়ে বলতে থাকেন, "আমরাও তো তাই চাই। কে না চায় বলুন। তাই বলে কি আজই সব হবে, না তা হতে পারে? ধীরে ধীরে আসবে সব। এখনই একৃট্রিমিষ্ট হয়ে কোনো লাভ আছে? একৃট্রিমিস্‌ম মানেই ভায়লেন্স, আর ভায়লেন্স বিগেট্‌স ভায়লেন্স!" বলেই ধনঞ্জয়বাবু এতক্ষণে একটা উঁচুদরের কথা বলতে পেরেছেন ভেবে খুশির হাসি হাসেন।

পর পর দিন কয়েক নতুন করে পড়ল আবার পুরনো পোস্টার-গুলো: ছাঁটাই করা চলবে না।……জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই।…… বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত কর। ইত্যাকার।

পড়ে—সবাই বুঝি পড়ে। অন্ততঃ আমার গৃহিণীও যে মাঝে মাঝে পড়ে তার প্রমাণ পেয়েছি। কালোবাজারের প্রসঙ্গে সেদিন বেশ প্রাসঙ্গিক-ভাবেই ঝেঁজে উঠেছিল, "গবর্ণমেণ্ট আমার হাতে দিক না সব ভার বুঝিয়ে। তোমাদের ঐ চোরাবাজার একদিনেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করব দেখে নিয়ো।"

আজকের আসরে নীচের তলার পেছন দিকের ফ্ল্যাটের কালীবাবুও আছেন।

বললাম, "বাড়িতে আজকাল গিন্নীরাও যে পলিটিক্স সুরু করে দিলে মশায়।"

"দেবে না!" কালীপদবাবু বললেন, "এতকাল পলিটিক্স ছিল বাইরে বাইরে। হাল আমলে তা ঘরে এসে ঢুকেছে—একেবারে রান্নাঘরের হাঁড়ির মধ্যে।"

"হ্যাঁ, পেটে টান পড়লে ও বস্তু আপনি আসে," টিপ্পনী করলেন অধ্যাপক।

চেয়ে দেখি আধা-বয়েসী লোক দেয়ালে একখানা পোস্টার লাগিয়ে চলে গেল। মফস্বলে কোথায় এক ভুখা-মিছিলের উপর পুলিশ লাঠি চালিয়েছে তারই সংক্ষিপ্ত খবর।

কালীপদবাবু রসিক লোক। তবে মাঝে মাঝে বড় মাত্রা ছাড়িয়ে যান। আরো একটা দোষ আছে। একবার একটা কথা পেলেই ব্যস্। আর কাউকে কথা বলতে দেবেন না। সুরু করে দিলেন, "আজকাল ঐ এক হিড়িক। কথায় কথায় মিছিল। চাল চাই, কাপড় চাই, হেন চাই, তেন চাই।—কেবল চেয়ে চেয়েই জিততে চায়। ও করে কোনদিন কিছু হয়েছে, না হবে?"

"ও ছাড়া আর কোন্ পথ আছে বলুন।"

কালীপদবাবু তার কৃত্রিম ক্রোধের ভাব এবার দ্বিগুণ চড়িয়ে দিয়ে বলেন, "আছে মশায়। সোজা, স্পষ্ট পথ। সব দেশের সব যুগের যা একমাত্র পথ।"

"যথা?" প্রশ্ন করে তাকে উস্‌কে দিতে চাই।

কালীপদবাবু ফিক্ করে হেসে গরম স্বর হঠাৎ নরম করে আনেন, "পথ মশাই যাই হোক না কেন, তাই বলে এমন সব ছিঁচকাঁদুনের মিছিল। হ্যাঁ, মিছিলের মতো মিছিল বার কর একটা, তবে না।"

"কেমন?"

"—এই ধরুন: ট্যাঁকে টাকা আছে, বাজারে কাপড় নেই। সমস্যাটা তো এই? বেশ তো পাঁচ টাকার আর দশ টাকার নোট গঁদের আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে এক-একখানা দেড়হাতি গামছা তৈরী করে তা-ই পারে যা না চলে কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে লাট সাহেবের বাড়ির কাছে। দিগম্বর-দিগম্বরীদের সাইলেণ্ট ডেমোস্ট্রেশন! শ্লোগানের দরকার নেই। দেখেই বুঝবে: টাকা আছে কাপড় নেই।"

আমি আর অধ্যাপক সলজ্জ বিরক্তি গোপন করে চুপ করে থাকি। ধনঞ্জয়বাবু কিন্তু একটু রসাল লেজুড় জুড়ে দিলেন, "তা করেও কোনো ফল হবে না মশায়। লাট-বেলাটের প্রাসাদে আজকাল যা কেত্তন-গানের ধুম, তাতে দূর থেকে বাইনোকিউলার চোখে লাগিয়ে মনে করবে নব ভারতের নব বৃন্দাবনের যত গোপিনীরা এসেছে।"

উৎসাহিত হয়ে কালীপদবাবু বোধ হয় আরো একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার মতলবে ছিলেন। বাধা পেলেন।

তেতলার ফ্ল্যাটের ধরণীবাবু আমাদের কাছে এসে সোৎসাহে জানালেন, "শুনেছেন"—

"কী?"

"কাল সকালে সাড়ে আটটায় আমাদের এই রাস্তা দিয়ে গবর্নর যাবেন—মনোরমা প্রসূতি ভবনের নতুন ওয়ার্ডের উদ্বোধন করতে।"

আমাদের এতদিনের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হল।

সকালবেলা রকে বসে আমরা খবরের কাগজ পড়ছি। এক পুলিশ কনস্টেবল দেয়ালের পোস্টারগুলো ছিঁড়তে লেগেছে। বুঝলাম তার উপরওয়ালার হুকুম। লাটসাহেবের গমন-পথে কোনোরূপ অবাঞ্ছিত দৃশ্য থাকলে চলবে না।

হঠাৎ রাস্তার একজন লোক কাছে গিয়ে কনস্টেবল-এর হাত চেপে ধরেছে—তাকে কিছুতেই পোস্টার ছিঁড়তে দেবে না। প্রথমে গালাগাল, পরক্ষণেই হাতাহাতি, তারপর ধস্তাধস্তি সুরু হয়ে গেল। হৈ-চৈ শুনে জড়ো হল এক ছোটখাটো জনতা।

রোগাটে লোকটাকে কাবু করতে কনস্টেবলটির বেশী সময় লাগল না। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল থানায়। অদূরে জনতা থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে।

এমন সময় মুহূর্তমধ্যে ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। জনতার মধ্য থেকে জন দশেক লোক বাজপাখির মতো কনস্টেবলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্পষ্ট দেখলাম তাদের মধ্যে আছে রসুল মিঞা, মোড়ের চায়ের দোকানের বয়টি, স্যাকরার দোকানের সেই কানা কর্মচারীটি 'রমা ফার্মেসি'র বাইরের বারান্দায় আমেরিকান লজেঞ্চ-বিস্কুট-চকোলেট বিক্রী করে যে বেঁটে ছোকরা সে-ও এবং আরও জনকয়েক অচেনা অজানা মুখ। বাকী জনতাও টগবগ করছে উত্তেজনায়।

লোকটাকে পুলিসের কবল মুক্ত করে তারা সামনের চৌমাথার দিকে চলল এক বিজয়ী সেনাবাহিনীর মতো।

আমাদের চোখের সামনে চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এমন অনর্থ ঘটবে কে ভেবেছিল।

'গতিক ভালো নয়' বলে অধ্যাপক উঠে দাঁড়ান। আমরা যে যার ঘরে ফিরে যাই। কেন না থানা বেশী দূরে নয়।

দোতলার ঘরের মধ্যে বসে দেখছি সব। দুই গাড়ি সঙ্গিনধারী পুলিস এসেছে। নেমেই প্রথমে তারা দেয়ালটা একেবারে সাফ করে দিলে—সিনেমার বিজ্ঞাপনগুলি শুদ্ধ। তারপর দুভাগ হয়ে একভাগ চলে গেল মোড়ের দিকে। ভাবলাম এবার শুরু হবে ধরপাকড় আর খানাতল্লাস।

মিনিট দশেক বাদে। রাস্তার উপর তোলপাড় কাণ্ড। লাট আসছেন। অসম্ভব ব্যস্ততার সাড়া পড়ে গেছে। ঘন ঘন হুইসিল। হটো, হটো: তফাৎ যাও: খাড়া রহো: ঠাড়ো উধার: হটো।

রাস্তার দু'ধারে নিরুদ্ধ নিশ্বাসের মতো থেমে গেছে সবকিছু। চলন্ত গাড়ি, পথচারী, ভিখিরি, বেওয়ারিশ বেড়াল-কুকুর-ষাঁড়—সব। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটি ভয়ঙ্কর মুহূর্তের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে।

এক, দুই, তিন, চার……

নক্ষত্রবেগে বার হয়ে গেল গভর্নরের গাড়ি।

বিকেলে আপিস থেকে বাসায় ঢুকে সিঁড়ির মুখে প্রশ্ন করি গৃহিণীকে, "তোমার ছেলে বাসায়?"

"হ্যাঁ।"

"আজ কোথাও যায়নি তো?"

"না গো স্কুল থেকে সোজা বাড়ি ফিরেছে।"

নিশ্চিন্ত হই।

সন্ধ্যার পর ধনঞ্জয়বাবু তাদের দোতলার বারান্দা থেকে ডাকলেন। আমাদের বারান্দার এক কোনে গিয়ে রেলিঙে ভর করে মুখ বাড়িয়ে অনুচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করি "মহীতোষ ফিরেছে?"

"না। সে জন্যেই তো ভাবনায় পড়েছি। বলে গেছে খেলার মাঠে যাচ্ছি। হতভাগাকে এত বলি, তবু রোজ রাত করে বাসায় ফিরবে।"

ওপারে দেয়ালের কাছে একজন কনষ্টেবল মোতায়েন রয়েছে সকালবেলার ঘটনাস্থলে। সারারাত পাহারা দেবে নাকি?

তেমনি অনুচ্চকণ্ঠে বলি, "মহীতোষকে এলে বলবেন অবজেক্শনেবল কাগজ-পত্তর কিছু থাকলে আজ রাত্তিরেই যেন সরিয়ে ফেলে।"

"না, সে ভয় নেই।" ধনঞ্জয়বাবু অভয় দেন, "যত বড় বড় কথা ওর

মুখেই।—আমরাও এককালে বলেছি মশাই। যাক্ আজ থেকে পাড়াটা ঠাণ্ডা হবে আশা করা যায়। শেষ পর্যন্ত ক'জন গ্রেপ্তার হল জানেন?"

"সতের জন।"

*

পরদিন সকালবেলা। যথাসময়ে নিচে যেতেই পরেশবাবু অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "দেখছেন তো? রাতারাতি কী কাণ্ড?"

"হুঁ। ভোরবেলা বিছানায় বসে বসেই দেখেছি সব।"

আবার পোস্টারে পোস্টারে দেয়ালের গায় কোথাও একটুকু ফাঁক নেই।

"ইঁদুরের রাজত্ব শুরু হল মশায়—ইঁদুরের রাজত্ব!" ধনঞ্জয়বাবু সভয় বিস্ময়ে বললেন, "বীজ ছড়াচ্ছে—সর্বনেশে মহামারীর বীজ!" *

* লেখকের 'ছোট-বড়-মাঝারি' গল্প-সংগ্রহ থেকে।

ভারতের শহর কলকাতা

Calcutta India's City: by Asok Mitra; New Age Publishers Private Limited; First Published 1963; pp. 99; Price Rs. 8·00

শ্রীঅশোক মিত্র ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শহর কলিকাতা সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলির নাম 'Calcutta belongs to the Nation', 'Calcutta is not Growing Fast Enough' ও 'The Trouble with Calcutta'। আলোচ্য পুস্তিকাটিতে প্রবন্ধ তিনটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

সম্প্রতি অবাঙ্গালী ভি. আই. পিরা অনেকেই শহর কলিকাতার নামকে খরচের খাতায় লিখে ফেলেছেন। পশ্চিম বাংলা ও বাঙ্গালীর শহর কলিকাতা। নোংরা ও ঘিঞ্জি। অশান্ত ও অস্থির। কেবল মিটিং, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ। অক্টারলনি মনুমেন্ট যেন বিদ্রোহী, অ্যানার্কিস্ট ও চির-ধর্মঘটী কলিকাতার প্রতীকরূপে সদম্ভে রণং দেহি বলে মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে শুনে প্রধান মন্ত্রী নেহরু পর্যন্ত বলে ফেললেন, মরে গেছে শহর কলিকাতা। কিন্তু রাস্তায় ধুলো উড়লে ধুলোটাকেই যেমন মনে হয় একমাত্র সত্য এবং নিচের রাস্তাটা মিথ্যে হয়ে যায়, কলিকাতা সম্বন্ধে অনেকটা তাই-ই ঘটেছে।

এই ভুলটা ভাঙানোর জন্যই অশোক মিত্রের লেখা। রাশি রাশি তথ্য উপস্থিত করে তিনি প্রমাণ করেছেন, কলিকাতা সর্ব-ভারতীয় শহর এবং ভারতের অর্থনীতিক গৃহস্থালীর একটা মোটা রকমের কাজ নানা অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কলিকাতা ভালোই করে চলেছে। নিজ শহর কলিকাতা ও বন্দর কলিকাতাও বটে, আবার বাঁশবেড়িয়া থেকে বনিতাবালা ও চাকদা থেকে বার্ণপুর পর্যন্ত বিস্তৃত কলিকাতা শিল্পাঞ্চলও বটে। কলিকাতা অঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ লোকের মাতৃভাষা বাংলা নয়, এক-চতুর্থাংশ লোকের মাতৃভাষা হিন্দী বা উর্দু এবং কর্মী বাহিনীর পঞ্চাশ শতাংশের বেশি অবাঙ্গালী। ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্কের বাৎসরিক জমায় এবং মনি-অর্ডারে টাকা পাঠানোয় ভারতের সকল শহরাঞ্চলের মধ্যে কলিকাতা অঞ্চলের স্থানই সর্বপ্রথম, যদিও সবাই জানে কলিকাতায় শ্রমিকদের মজুরি অপেক্ষাকৃত কম। তার উপর আছে ছুটিছাটায় অবাঙ্গালী কর্মীদের কলিকাতা

থেকে দেশে বেশ কিছু টাকা নিয়ে যাওয়া। যে সকল চেম্বার অফ কমার্স কলিকাতা অঞ্চলের শিল্প ও বাণিজ্যের বিধাতা তাদের হর্তাকর্তাদের পনর আনাই অবাঙ্গালী। 'Indianness of Content'! মোলায়েম সত্যভাষণের কি সুন্দর নমুনা! ভারতের মোট ব্যাঙ্ক আপিসের মাত্র ছয় শতাংশ পশ্চিম বাংলায় (বেশির ভাগই কলিকাতায়), অথচ ভারতের তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের ষোল শতাংশ এবং মোট দাদনের পঁচিশ শতাংশ পশ্চিম বাংলায়। ভারতে একাত্তরটি বিদেশী ব্যাঙ্ক আপিসের একুশটিই রয়েছে শহর কলিকাতায়। ভারতের যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলির আটাশ শতাংশ ও তাদের প্রদত্ত মূলধনের তেইশ শতাংশ পশ্চিম বাংলায়। পশ্চিম বাংলায় সংগৃহীত হয় ভারতীয় আয়করের আটাশ শতাংশ ও সুপার ট্যাক্সের চৌত্রিশ শতাংশ। কিন্তু কলিকাতার প্রধান গৌরব হল কলিকাতা বন্দর। ভারতের প্রায় অর্ধাংশ কলিকাতা বন্দরের উপর স্বাভাবিক ভাবে নির্ভরশীল। ভারতের মোট রপ্তানির পঁয়তাল্লিশ শতাংশ ও মোট আমদানির আটত্রিশ শতাংশ কলিকাতা বন্দর মারফত। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশই অর্জন করে কলিকাতা বন্দর। কলিকাতার শ্রমিকরা কি উচ্ছৃঙ্খল, ফাঁকিবাজ ও অকর্মণ্য? এইরকম একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় বটে। এ সম্বন্ধে অশোক মিত্রের মত উদ্ধৃতিযোগ্য :

"Calcutta's labour has not shed its skill. In fact, despite the stoppages, lockouts and strikes with which Calcutta's labour is often associated, it is generally conceded by industrialists that it more than makes up for lost time once it starts work. What is more, the discipline of the trade unions is good and once an understanding is reached in the Works Committee or adopted in the code of discipline it is respected. Maintenance and repairs are economical. Break-downs, injury to machinery owing to lack of routine maintenance, so common elsewhere, are low."

কিন্তু কলিকাতা সম্বন্ধে এত কথা বলা কেন? উদ্দেশ্যটা কি অশোক মিত্রের? শুধুই কলিকাতার প্রতি ভারতের ভি. আই. পিদের মনকে প্রসন্ন করে তোলা অথবা কফি হাউসের বিতর্কে কলিকাতা সম্বন্ধে যাতে

দু-চারটে ভালো ভালো কথা বলা যায় তার খোরাক যুগিয়ে দেওয়া? অবশ্যই নয়। কলিকাতা সম্বন্ধে রীতিমতো উদ্বেগের কারণ আছে এবং কিছু আশু এবং অবশ্য করণীয় আছে। উদ্বেগ প্রধানত এইজন্যে যে কলিকাতা যথেষ্ট বাড়ছে না। এই প্রসঙ্গেই অশোক মিত্র এমন অনেক তথ্য উপস্থিত করেছেন যা বহুলোকেরই অজানা। একদিন ছিল যখন বোম্বাই কলিকাতাকে হিংসা করত। কিন্তু এখন চাকা ঘুরে গেছে। বর্তমানে বোম্বাইয়ের ক্ষেত্রফল (area) একশত ছিয়াশি বর্গ মাইল, কলিকাতার চল্লিশ বর্গ মাইল এবং কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের (শহর কলিকাতা সমেত) একশত সত্তর বর্গ মাইল। পঞ্চাশ দশকে নানা দিক থেকে কলিকাতার বাড় কি রকম স্তিমিত হয়েছে এবং তুলনামূলক ভাবে কলিকাতা কেমন পিছিয়ে পড়েছে তা ভাবলে সত্যই উদ্বিগ্ন হতে হয়। দশ বছরে পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা বেড়েছে তেত্রিশ শতাংশ, কলিকাতার জনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র আট শতাংশ এবং কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের জনসংখ্যা বেড়েছে কুড়ি শতাংশ। এই দশ বছরে বোম্বাইয়ের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় উনত্রিশ শতাংশ। ১৯৫০ সালে ভারতের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ত্রিশ শতাংশ ছিল পশ্চিম বাংলায় কিন্তু ১৯৬০-৬১ সালে তা দাঁড়ায় ষোল শতাংশ। দশ বছরে পশ্চিম বাংলায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ে একশত পাঁচ কোটি ইউনিট থেকে দুইশত চব্বিশ কোটি ইউনিট কিন্তু বোম্বাই রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ে একশত একষট্টি কোটি ইউনিট থেকে চারশত এক কোটি ইউনিট। পঞ্চাশ দশকে রেজিষ্ট্রীভুক্ত ফ্যাক্টরিতে দৈনিক কর্মীনিয়োগ বাড়ে পশ্চিম বাংলায় কিছু কম পাঁচ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ এবং গুজরাটে তের শতাংশ। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১, এই পাঁচ বছরে ভারতে শিল্পোদ্যোগের তিন হাজার সাতশত নব্বুইটি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছিল; তার মধ্যে ছয়শত পঁচিশটি পায় পশ্চিম বাংলা এবং চৌদ্দশত বিয়াল্লিশটি পায় মহারাষ্ট্র ও গুজরাট। পঞ্চাশ দশকে ডেলি প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা বাড়ে বোম্বাই শহরে উনত্রিশ কোটি থেকে বিয়াল্লিশ কোটি এবং কলিকাতা শহরে কিছু কম চার কোটি থেকে ছয় কোটি। ভারতের রেলপথগুলির মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়ান, ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্টার্ন রেলপথগুলির সঙ্গে কলিকাতার সম্পর্ক। পঞ্চাশ দশকে এই তিনটি রেলপথে দ্রব্য চলাচলের টন-মাইলত্ব বাড়ে একত্রিশ শতাংশ। ওই দশ বছরে ভারতের সমস্ত রেলপথে দ্রব্য চলাচলের টন-মাইলত্ব বাড়ে নিরানব্বুই শতাংশ।

১৯৫৮-৫৯ থেকে ১৯৬০-৬১, এই দুই বছরে সংগৃহীত আয়কর (বৃহত্তর অর্থে) পশ্চিম বাংলায় চুয়ান্ন কোটি টাকা থেকে কমে দাঁড়ায় সাড়ে উনপঞ্চাশ কোটি টাকা কিন্তু মহারাষ্ট্রে একান্ন কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয় সাড়ে বাহান্ন কোটি টাকা।

তথ্যের উপচার বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। তার শেষই বা কোথায়। মোটের উপর অশোক মিত্র তাঁর প্রধান পয়েন্টটা ভালমতোই দাঁড় করিয়েছেন। পশ্চিম বাংলা পিছিয়ে পড়ছে। শহর কলিকাতা যথেষ্ট বাড়ছে না। কলিকাতা শিল্পাঞ্চল থেকে মূলধনের পলায়নের প্রথম লক্ষণ সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। এসব কথার সঙ্গে একমত হতে কারো এক সেকেণ্ডের বেশি লাগবে না। কিন্তু কেন শহর কলিকাতার এই দুর্গতি? এ সম্বন্ধে অশোক মিত্রের বক্তব্যই এই ছোট্ট বইটির সবচেয়ে মৌলিক, মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক অংশ। বোম্বাই ও কলিকাতার মূলগত পার্থক্য এই যে, বোম্বাইয়ে যে ব্যবসায়ী শ্রেণী উদিত হয়েছিল তা স্থানীয়। তারা বোম্বাইকে আপন শহর বলে মনে করত। নাড়ীর টান ছিল তাদের বোম্বাইয়ের প্রতি, দূরদৃষ্টিও ছিল তাদের বোম্বাইয়ের ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্বন্ধে। সেখানে ফেরোজশা মেহতার মতো বিরাট পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁর ধ্যানধারণার বিষয় ছিল শহর বোম্বাইয়ের উন্নয়ন এবং যাঁর জীবন ছিল বোম্বাইয়ের প্রতি উৎসৃষ্ট। শহর কলিকাতার ইতিহাস ভিন্ন ধরনের। এখানে ব্যবসায়ী শ্রেণীর আগমন বাংলার বাইরে থেকে। বরাবরই তাঁদের লক্ষ্য এখানকার ক্ষীর সর ছানা যতটা পারা যায় ছেঁকে তুলে নেওয়া, পৌর ব্যাপারাদিতে বেশি জড়িয়ে না পড়া, শুধু টাকার জোরে উচ্চ থেকে উচ্চতর মূল্যে যতটা সম্ভব জমি হাতিয়ে নেওয়া বাদে। সমস্ত, স্থানীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ গেড়ে বসে থেকেছে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানে। বুরোক্রাটদের সাহায্যে তারা গড়ে তুলেছে রেণ্ট কণ্ট্রোল অর্ডারের মাজিনো লাইন। এই তাদের প্রতিশোধ বৃহৎ ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে। কলিকাতার প্রতি উৎসৃষ্ট-জীবন লোক খুব বেশি দেখা গিয়েছে কি শহর কলিকাতায়? আর দূরদৃষ্টি? ক্ষুদ্র স্বার্থের অদূরদর্শিতা বিখ্যাত। বুরোক্রাটরা এদিক থেকে তাঁদের উপর দিয়ে যান। কলিকাতাকে ঢেলে সাজানোর, গড়ে তোলার ও প্রসারিত করার মতো উদ্যোগ ও লগ্নীকরণ প্রবৃত্তি? একান্তই অভাব, ঘটেছে এই সবের। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট অনেক ভালো কাজ করেছে কিন্তু তার উল্টো দিকে রয়েছে জমির দামের আকাশচুম্বী বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র মানুষের উচ্ছেদ। নিজের

বাসের জন্য বাড়ি করাই কলিকাতায় নিরাপদ। ভাড়া খাটানোর জন্য বাড়ি করার উদ্দীপনা নেই। কি করে থাকবে যখন এক দিকে রয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জ এবং অন্য দিকে রয়েছে রেণ্ট কণ্ট্রোল অর্ডারে বেঁধে-দেওয়া নীট সওয়া ছয় শতাংশ প্রতিদান? সুতরাং কলিকাতা রয়ে গেছে বহুলাংশে বস্তি, কুঁড়ে, একতলা, দোতলা, জরাজীর্ণ বাড়ির শহর যদিও পৃথিবীর কম শহরেই কলিকাতার মতো এমন চড়া দামে জমি বিকোয়। কলিকাতার নানা প্যারাডকসের অন্যতম। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যই অশোক মিত্র কলিকাতার দিকে সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। কলিকাতা ভারতের শহর, সর্ব-ভারতীয় শহর। তার সমস্যার সমাধানের জন্য কি দরকার? অশোক মিত্র বলছেন:

"Clearly, a nation-wide lobby is indicated which will be solicitous of the goose that lays the golden egg···this lobby has to appear as much from among the national political parties and the big industrial and commercial interests as from those who own the city and work in it. It should be the Parliament's and the nation's concern."

অশোক মিত্র শহর কলিকাতা সমস্যা এবং আরো অনেক সমস্যা সম্বন্ধে অথরিটি। তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করার মতো বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও সাহস নিজের মধ্যে আদৌ খুঁজে পাচ্ছি না। বিতর্ক করতে ঠিক চাইও না। লেখাটি পড়ে মোটের উপর তাঁর চেলা বনে গেছি। তবু দু-চার কথা বলতে দোষ কি? না হয় ভুল কথাই বলব।

রেণ্ট কণ্ট্রোল অর্ডার কেন কলিকাতার বাড়কে ব্যাহত করেছে, এ সম্বন্ধে অশোক মিত্রের এক কথা। জমিবাড়িতে লগ্নীকরণের ওই নীট সওয়া ছয় শতাংশ প্রতিদান। অতি-সরলীকরণ হয়ে গেছে। বাস্তব প্রক্রিয়াটি আরো অনেক জটিল। তার জট ছাড়িয়ে ভিতরকার কথাটিকে টেনে বের করতে তিনি পারেন নি। বোধ হয়, প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য ও পরিসর তাঁকে এই কাজে প্রবৃত্ত হতে দেয়নি। তাই অনেকেই অশোক মিত্রকে ভুল বুঝেছেন, মনে করেছেন বুঝি-বা তিনি বলতে চাইছেন, রেণ্ট কণ্ট্রোল অর্ডার তুলে দাও, পুরাতন প্রজাদের ভাড়া তিন চারগুণ বাড়ুক, তাদের উচ্ছেদ ঘটুক, এবং তাহলেই এই নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে

কলিকাতার বাড়বাড়ন্ত ঘটবে। সাংঘাতিক ভুল বোঝা। অবশ্যই অশোক মিত্র তা বলতে চান না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর সামগ্রিক উপমাটা এই ধারণাই সৃষ্টি করেছে।

জমিবাড়িতে লগ্নীকরণের প্রতিদান দিল্লীর তুলনায় কলিকাতায় বাস্তবিক কি এতই কম যতটা অশোক মিত্র দেখাতে চেয়েছেন? তা কিন্তু মনে হয় না। ধরা যাক, দক্ষিণ কলিকাতায় কোনো এক জায়গায় ছয় কাঠা জমির উপর একটি তেতলা মাঝারি গোছের ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করা হল। প্রতি তলায় তিনটি করে ফ্ল্যাট। বৎসরে মোট ভাড়া বাবদ পাওয়া যাবে নীট চৌত্রিশ হাজার টাকার কিছু বেশি তো কম নয়। জমি ও বাড়িতে লগ্নীকরণ হবে, ধরে নিচ্ছি, দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকার বেশি নয়। তাহলে প্রতিদান দাঁড়াচ্ছে সাড়ে বারো শতাংশ। খুব নিরাপদ মার্জিনকেও ঝানু বাড়িওয়ালা আট থেকে দশ শতাংশের নিচে ধরবেন না। দিল্লীর দৃষ্টান্তে অশোক মিত্র ধরেছেন, জমির ও বাড়ির খরচা বাইশ টাকা বর্গ ফুট। অনেক কম করে ধরেছেন মনে হচ্ছে। দিল্লী বুম টাউন।

এক জায়গায় অশোক মিত্র বলেছেন, কলিকাতায় জলের ও স্যানিটেশানের সীমাবদ্ধতাই কলিকাতার জনসংখ্যার স্বল্প বৃদ্ধির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা। তা যদি হয় তাহলে শুধু রেণ্ট কণ্ট্রোল অর্ডার সম্বন্ধে এত বিলাপ কেন, বিল্ডিং বুম দেখা যায় নি বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলা কেন? জলের ও স্যানিটেশানের সীমাবদ্ধতা, পরিবহণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, এই সব দূর না হলে বিল্ডিং বুমের ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির বিলাস কলিকাতার পক্ষে পোষায় না। বাড়ি তৈরি হচ্ছে না হচ্ছে না করেও যথেষ্ট হচ্ছে। খালি জমি কোথাও প্রায় পড়ে থাকতে দেখা যায় না। ঘিঞ্জিপনা এখনই এমন উগ্র যে তা আরো উগ্রতর হলে অবস্থা কি রকম দাঁড়াবে তা একটা বিভীষিকা।

হ্যাঁ, কলিকাতার বাড়া দরকার। চাই আরো জল, আরো ভালো ও বড় রকমের স্যানিটেশানের বন্দোবস্ত, বৃহত্তর ও নূতনতর পরিবহণ ব্যবস্থা। বিল্ডিং বুমও চাই। শুধু খালি জমিতে নতুন বাড়ি তৈরিই নয়। পুরাতন জরাজীর্ণ বাড়ি ভেঙে ফেলে সেই জায়গায় আধুনিক ধরনের বহুতলা বাড়ি বানানো দরকার। বস্তি ভেঙে বস্তিবাসীদের এক-কামরা, দেড়-কামরা, বহুতলা ফ্ল্যাট বাড়িতে সরানো দরকার কিন্তু আগেকার মতো ভাড়ায় বা তার চেয়ে দু-এক টাকা বেশি ভাড়ায়। কলিকাতায় জমির দাম বাড়তে বাড়তে

যাতে জ্যোতিষিক স্তরে না পৌছয়, তার জন্য জমির দামের উপর সীলিং স্থাপন করা দরকার। অনেক দিন আগেই তা করা উচিত ছিল। লজিকের দিক থেকে কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের আটাশটি ছোট শহরের সঙ্গে শহর কলিকাতার পৌর একীভবন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কি করে এসব হবে। "নেশ্যন-ওয়াইড লবি"? সেই কবিতার লাইন মনে পড়ে যাচ্ছে, 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন'। সেই তিনিটি কে? এবং মেলানোই কি তাঁর কাজ? ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টিজ, কথাটা শুনলেই আমি ভয় পাই। সম্প্রতি পাচ্ছি। যাঁদের ধর্মই হল নিজেদের মধ্যে 'সীনথেটিক' ও কিঞ্চিৎ 'ফোনি' ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করা তাঁরা কলিকাতার মঙ্গলামঙ্গল ও হ্রাসবৃদ্ধি সমস্যা, এমন একটা ব্যাপার সম্বন্ধে একমত হবেন, এই উদ্ভট কল্পনার কাছে হার মানলাম। 'দুর্বলের অত্যাচার' শহর কলিকাতাকে বাড়তে দেয় নি। হ্যাঁ, নগ্ন সত্য এবং একথা বলার সাহস অশোক মিত্রের আছে। আবার বৃহৎ ব্যবসায়ী স্বার্থ কলিকাতাকে কেবল চমৎকার মৃগয়াভূমি রূপেই দেখে এসেছে এবং দখল করবার তালে থেকেছে, এটাও সমানই নগ্ন সত্য এবং এ সম্বন্ধে সচেতনতা অশোক মিত্রের মনে নেই তা নয়। তাই অবাক হই যখন দেখি, অশোক মিত্র এই মিরাকল প্রত্যাশা করেন যে একটা "নেশ্যন-ওয়াইড লবি" গড়ে উঠলেই কলিকাতায় বৃহৎ ব্যবসায়ী স্বার্থের ও ক্ষুদ্র স্বার্থের কোলাকুলি ঘটবে এবং তা দেখে আমাদের সকলের চোখ জুড়োবে। ততদিন কি আমরা বেঁচে থাকব? ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি যে, প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগ ও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা ব্যতীত নতুন ও বৃহত্তর কলিকাতা সম্বন্ধে যে স্বপ্ন অশোক মিত্র দেখেছেন তা সিদ্ধ হবে না। অবশ্য সি. এম. পি.-ও খাড়া করা হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে ওই স্বপ্নের সিদ্ধি ঘটবে কি? অনেক জিনিস হঠাৎ বিশ্বাস করে ফেলার চেয়ে অবিশ্বাসী থাকাই ভালো।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

Their Majesties the Mob : John W. Caughey ; University of Chicago Press ; Chicago.

পরিচ্ছন্নমনা নির্ভীক তরুণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির হত্যাকাণ্ডে বেদনা-বিমূঢ় জগতের জিজ্ঞাসা ছিল, কে এই হত্যাকারী, কেন এই হত্যা? এ-দুটি প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তর জগতের কাছে এখনও পৌছয় নি ; তবে আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগ F. B. I নাকি হত্যাকারী কে, এই প্রশ্নে নিশ্চিত হয়েছে। সে নাকি লী অসওয়াল্ড। এই হত্যাকাণ্ডকে প্রগতি-বিরোধী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছে, তবে সংগৃহীত তথ্য এত অনির্ভরযোগ্য যে ও-দেশের সাম্যবাদী সংগঠন বা সাম্যবাদকে কাঠগড়ায় উপস্থিত করা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। কিন্তু এই সূত্রে 'মুক্ত-দুনিয়া'র পীঠস্থান আমেরিকার সমাজ ব্যবস্থাকেই যে হয়তো বিশ্ব-বিবেকের আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে সে সম্ভাবনা হয়তো এখনও অনেকের মনে ওঠে নি।

অত্যন্ত দুঃস্থ পরিবারের ছেলে লী অসওয়াল্ড বাল্যকালেই অপরাধ-প্রবণতা অর্জন করে। তাকে মনস্তাত্ত্বিকরা বিপজ্জনক বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন ও কোনো মানসিক হাসপাতালে রাখার নির্দেশ দেন। সেটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। আমেরিকায় যে সামাজিক পরিবেশ বিদ্যমান, তার ফলে তরুণদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা ও হিংস্রতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে, একমাত্র সাম্যবাদী আন্দোলন ও প্রগতিমূলক সংগঠনগুলি ছাড়া প্রায় সব কিছুই অনিয়ন্ত্রিত, অন্তত যথেষ্ট পরিমাণে সংযত নয়। অনেক ক্ষেত্রেই প্রায়-অরাজকতা বর্তমান*। ১৯৫৭ সালে অপরাধের জন্য ২০ লক্ষ ৭০ হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। প্রত্যেক বছর এই হার বেড়ে চলেছে। ১৯৫৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে সেই রাজ্যে ১৭ বছর বয়স্ক প্রতি চারজন ছেলের মধ্যে অন্তত একজনকে কোনো না কোনো অপরাধের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল। Frederic Wertham তাঁর Seduction of Innocent বইটিতে কি ভাবে তরুণদের মন বিবেকবর্জিত

---

* মার্কিন সমাজব্যবস্থা বর্তমানে কি মাত্রায় 'মগের মুলুকে' পরিণত হয়েছে তার পরিচয় পেতে হলে Daniel Bell লিখিত 'The End of Ideology গ্রন্থের ৭ম (Crime As An American Way of Life') এবং ৯ম ('The Racket-ridden Longshoremen') পরিচ্ছেদ দুটি অনুধাবনযোগ্য।

তথাকথিত 'কমিক-বুক' প্রকাশকারী ব্যবসায়ীরা কলুষিত ও অপরাধপ্রবণ করে তুলছে তার চাঞ্চল্যকর আলোচনা করেছেন। একটা সমাজব্যবস্থা কি ভাবে অপরাধীদের সৃষ্টি করে, আমেরিকা তার উদাহরণ। শুধু লী অসওয়াল্ডকে দোষ দিলে চলবে কেন? অসওয়াল্ড সম্পর্কে যতদূর জানা গেছে, সে আজীবন নৈরাশ্য-প্রবণ, ক্ষুব্ধ ও সমাজ-বিরোধী ছিল। সুস্থতর সমাজে তার হয়তো অন্য চেহারা দেখতাম।

গোবরের আর একপিঠের 'হিরো' জ্যাক রুবি বা রুবেনষ্টীন-এর দিকে তাকালেও সেই একই প্রশ্ন ওঠে। শিকাগো নগরীতে 'Bloody Twentieth' পাড়াতে জাত ও বর্ধিত বখাটে ছেলে রুবি স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে নি। তবে আমেরিকায় এই ধরনের 'চালু' ছেলেদের জীবনে 'প্রতিষ্ঠিত' হতে অসুবিধা হয় না। গুণ্ডা এবং জুয়াড়ীদের সাহায্যে এবং পুলিশ ও শাসন কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় ডালাস শহরে সে প্রমোদসুন্দরীদের নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে মধুচক্রের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। অপরাধী জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বেশ ঘনিষ্ঠ। হঠাৎ কেনেডির হত্যাকাণ্ডে তার দেশপ্রেম এবং মানবতাবোধ নাকি উথলে উঠেছিল, যার ফলে সে কমিউনিস্টদের (লী অসওয়াল্ডকে প্রথমে কামউনিস্ট এবং কাস্ট্রোপন্থী বলে চিহ্নিত করা হয়) হাত থেকে পবিত্র গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য চরম আত্মত্যাগে প্রস্তুত হয়ে অসওয়াল্ডকে হত্যা করে। (ফলে অবশ্য অসওয়াল্ডের জবানবন্দী থেকে আসল সত্য উদ্ঘাটিত হবার যে সম্ভাবনা ছিল তা ভ্রূণে বিনষ্ট হল) অসওয়াল্ড দোষী কি নির্দোষী, কিম্বা আসলে রুবিকে ঘিরে একটা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রই কেনেডিকে হত্যা করেছে কি না সে প্রশ্নে আমরা যেতে চাই না। আমাদের প্রশ্ন বর্তমান আমেরিকায় এমন পরিস্থিতি রয়েছে কিনা যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল এবং সমাজবিরোধীদের ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য এবং যখনই প্রয়োজন হয় তখনি তারা আইন নিজেদের হাতে তুলে নেয়। হয়তো আমাদের এই সন্দেহ বিশ্বাসের উপকণ্ঠে এসে হাজির হত না যদি না মার্কিন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে অধুনা-লিখিত কয়েকটি বই আমাদের হাতে এসে না পড়ত। আলোচ্য বইটি তাদেরই একটি।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন কাফি একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক! তিনি গত এক শতাব্দীর সরকারী এবং নির্ভরযোগ্য নথীপত্র থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলি সংকলিত করে আমেরিকায় vigilantism-এর সূত্রপাত এবং

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। Vigilantism-এর সঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় বিরল। এদেশেও চুরি-ডাকাতির প্রতিরোধে বা দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় যে ধরনের রক্ষীদল, অথবা অধুনাতম উদাহরণ মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধে যে ধরনের সব সংগঠন গড়ে ওঠে, তেমনি ও-দেশেও গত শতাব্দীর মাঝামাঝি যেখানে যেখানে শাসনব্যবস্থা শিথিল ছিল, সেই সব জায়গায়, বিশেষত পশ্চিম প্রান্তে স্বর্ণ ও তৈল-সম্পদ সন্ধানীদের মধ্যে Vigilant Committee গড়ে ওঠে। নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি বা অন্যান্য বিবাদে আদালতের বিচার প্রার্থনা করা দূরত্ব এবং অন্য নানা কারণে প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই অভাব পূরণের জন্যই এই ধরনের কমিটিগুলি আপাতদৃষ্টিতে বে-আইনী হলেও বিচারের ভার নিজেদের হাতেই তুলে নিয়েছিল। ১৮৫৬ সালে সানফ্রান্সিসকো নগরীর শাসনব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় একই উদ্দেশ্যে বিখ্যাত Sanfransisco Committee গঠিত হয়েছিল। সূত্রপাতে উদ্দেশ্য যতই ন্যায্য হোক, ক্রমপরিণতিতে এই Vigilantism বা প্রহরীবাদ যে রূপ নিয়েছে তাকে গুণ্ডারাজ বললে অসঙ্গত হয় না, যার উদাহরণ হল Ku Klux Klan জাতীয় সংগঠন। Vigilantism-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা বা অযোগ্যতার জন্য নিজেদের হাতে কর্তৃত্ব বা আইন তুলে নেওয়া। এই ধরনের মতবাদ বা সংগঠনকে উৎসাহিত করা দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে অস্বাভাবিক। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে এই ধরনের আইন-উপেক্ষাকারী সংগঠনে বড় বড় কর্তাদের প্রকাশ্য যোগাযোগ ছিল এবং বর্তমানেও আছে। ("It is wellknown, however, that at its peak, the Ku Klux Klan enrolled Mayors, Governors, State Legislators, Members of Congress and Judges."—p. 16)

অধ্যাপক কাফি কর্তৃক উদ্ধৃত তথ্যগুলি আমাদের কাছে এই সত্যই উদ্ঘাটিত করে যে, আমেরিকাতে শুধু সামাজিক অরাজকতাই বর্তমান তাই নয়, ও-দেশের সর্বোচ্চ শাসকমণ্ডলীও সময় সময় আইন-উপেক্ষাকারী vigilantism বা 'প্রহরী-বাজি'-র সামনে অসহায় বোধ করে। বস্তুত Senator McCarthy এবং House Un-American Activities Committee-র প্রতাপে কিছুদিন পর্যন্ত আইজেনহাওয়ারের মতো বিপুল ক্ষমতাশালী মার্কিন রাষ্ট্রপতিকেও কি পরিমাণ বিচলিত হতে হয়েছিল তা হয়তো অনেকেরই

স্মরণে আছে। Un-American Committee-ও যে একটি Vigilant কমিটি সে তথ্য বোধহয় সকলের জানা নেই ; অবশ্য অন্যান্য 'প্রহরী সংগঠন'-এর সঙ্গে এর তফাৎ এই যে, এই সংগঠন অনেকটা সরকারী সমর্থনপুষ্ট ছিল।

সেনেটর ম্যাক্‌কার্থির গুরু হলেন মিচেল পামার। এই মিচেল পামার উড্রো উইলসনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। পামার প্রগতিবাদীদের নির্মূল করার জন্য যে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন তার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ অধ্যাপক কাফি উদ্ধৃত করেছেন। নিচে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল :

> "The essential lawlessness of the procedure—arresting cltizens and aliens on suspicion of membership in an organization *thought* to be subversive, search and seizure without warrant, detention in incommunicado, delay and inadequacies in the hearings on deportation and so forth—these features illustrate how executive branch of government descended to methods of extra-legal trial and punishment. The courts so found."

মিচেল পামারের সন্ত্রাসরাজই সেনেটর ম্যাক্‌কার্থির নেতৃত্বে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। আজও প্রচ্ছন্ন ভাবে হলেও সেই রাজই মার্কিন দেশে কায়েম। সর্বপ্রকার প্রগতিবাদী আন্দোলন ও সংগঠনকে বিনষ্ট করাই বর্তমানে মার্কিনী vigilantism-এর লক্ষ্য। এ সম্পর্কে ১৯২০ সালের একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঐ সালে নিউইয়র্ক বিধানসভায় সম্পূর্ণ বৈধভাবে নির্বাচিত পাঁচজন সোশ্যালিস্ট সদস্যের সদস্যপদ খারিজ করে সভা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়, কারণ তাঁরা নাকি "রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী" দলের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁদের বহিষ্কৃত করার জন্য প্রচণ্ড জনমতের হল্লা সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই সম্পর্কে অধ্যাপক কাফি কর্তৃক উদ্ধৃত Z. Chafee-র মন্তব্য থেকে আমরা মার্কিনী গণতন্ত্র সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারি :

> "Since the 15th day of June 1917 the nation had been led by its panic-stricken fear of adverse opinion to abandon one national tradition after another.... One

by one right of freedom of speech, the right of assembly, the right of petition, the right to protection against unreasonable searches and seizures, right against arbitrary arrest, right to a fair trial···had been sacrificed and ignored···. And now the waves of hysteria dashed against the very foundation of American life, the right of people to elect their own rulers."

বলা বাহুল্য যে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর 'গণতান্ত্রিক' আমেরিকার এই ছবি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও বিন্দুমাত্র বদলায় নি। তার প্রচুর সাক্ষ্য আলোচ্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। মার্কিনদেশে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বা শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায় না তা নয়, কিন্তু শাসকশ্রেণী এমন এক সমাজ ও সমাজ-মানসিকতার সৃষ্টি করেছে যার কাছে এই সব কণ্ঠস্বর অরণ্যে রোদন মাত্র।

যে প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল, কেনেডি-হত্যা এবং তৎপরবর্তী অসওয়াল্ড-হত্যা নিতান্তই সাময়িক মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ অহেতুক নয়।

প্রগতি-বিরোধিতা ছাড়াও মার্কিন 'প্রহরী-বাজি' নিগ্রোদলন ও অনুরূপ জাতি-বিদ্বেষের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অধ্যাপক কাফি নানা তথ্য ও ঘটনা উদ্ধৃত করে প্রহরী-বাজির নানা দিক তুলে ধরেছেন। ভারতেও এই ধরনের সম্ভাবনার আভাস যে আমরা পাই নি তা নয়। এই ধরনের বই তাই আমাদেরও সতর্ক করে দেয়।

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা। করুণাসিন্ধু দে। দাম দু' টাকা।
মানুষ শহর সমুদ্র। কমলেশ সেন। দাম দু' টাকা।

আলোচ্য দুজন কবিই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখে বেশ পরিচিতি অর্জন করেছেন। এঁদের দুজনের দুখানি বই পড়ার পর কবিতা রচনায় এঁদের সচেতন প্রয়াস এবং নিষ্ঠা বেশ উপলব্ধি করা গেল।

করুণাসিন্ধু দে তাঁর এই গ্রন্থে ধৃত একষট্টিটি কবিতার প্রায় প্রত্যেকটিতে সার্থকতা দাবী করতে পারেন। অধিকাংশ কবিতাই ভাববৈশিষ্ট্য ও বর্ণনাভঙ্গির চমৎকারিত্বে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। ছন্দোব্যবহারে এবং শব্দচয়নেও কবির নৈপুণ্য লক্ষ্য করা গেল। অথচ, তাঁর কবিতার একজন আগ্রহী পাঠক হিসেবে একথা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এ বই-এর প্রায় সবগুলি কবিতাই "ভালো কবিতা" হওয়া সত্ত্বেও আশ্চর্য স্বকীয় দীপ্তিমণ্ডিত "অবিস্মরণীয় কবিতা" হয়ে উঠতে পারে নি। কবিতাগুলি তাই সুখপাঠ্য হয়েছে মাত্র—মুখে মুখে আবৃত্তিযোগ্য পংক্তির সংখ্যা পরিমাণে অনেক কম। অথচ এই প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ কবির কাছে কয়েকটি প্রথমশ্রেণীর কবিতা আশা করা অসঙ্গত নয়।

কিন্তু কবির নিষ্ঠাবান অনুশীলনের যে ছাপ বইটিতে পাওয়া যায় তাও নিতান্ত সাধারণ স্তরের নয়; তরুণতম কবিদের মধ্যে এমন সনিষ্ঠ কাব্যপ্রচেষ্টা বড়ো একটা দেখা যায় নি। সেদিক দিয়ে তাঁর এই বই-এর প্রচার আরো বেশি কামনা করি। ছাপা, বাঁধাই ভালো। পূর্ণেন্দু পত্রী রচিত প্রচ্ছদ বইটির মর্যাদা বাড়িয়েছে।

কমলেশ সেন আদর্শবাদী কবি। নিবিড় অস্তিত্ববোধ তাঁর এই বই-এর সংকলিত প্রত্যেকটি কবিতার উৎস। কবিতাগুলি গদ্যছন্দে রচিত। এবং পড়ে একথা মনে হল গদ্যছন্দের সার্থক প্রয়োগরীতি কবির আয়ত্তাধীন। শব্দচয়নেও তিনি গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে এসেছেন। কিন্তু কবিতাগুলির মধ্যে কবির স্বকীয়তার পরিচয় বড় একটা পাওয়া গেল না। বক্তব্যের ক্ষেত্রে সিরিয়াস মনোভাবের প্রকাশ থাকলেও রচনারীতির দিক দিয়ে কোনো কোনো কবিতায় একজন অগ্রজ কবির অস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। যেমন —'বন্দুকের কুঁদার মতো মানুষ' কবিতাটি। তা সত্ত্বেও মোটামুটি কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ ও সুখপাঠ্য। বিশেষ করে 'মহাকাব্য' 'প্রিয়তমা বধু আমার',

'আত্মজকে', 'তোমার হাতে', 'পুতুলের সংসার' ও 'সন্দীপের গান' প্রভৃতি কবিতা বেশ ভালো রচনা। সাম্প্রতিককালে কিছু কবিযশঃপ্রার্থীর উন্মার চীৎকার ও যৌনবিকারগ্রস্ত প্রেমের ইয়াংকী-ধরনের বহিঃপ্রকাশের পাশাপাশি বলিষ্ঠ জীবনবোধে দীপ্ত, অস্তিধর্মী প্রত্যয়জাত এই কবিতাগুলি পাঠকের চিত্তে এক নতুন স্বাস্থ্যকর আস্বাদ এনে দিতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস॥ হরেন্দ্রচন্দ্র পাল॥ ডি. এম্. লাইব্রেরী॥ ৪·২৫

মুখে আমরা জাতীয় সংহতির কথা বলি, কিন্তু কার্যত আমরা আমাদের প্রতিবেশীকে চিনি না। প্রতিবেশীদের ভাষা, সাহিত্য, আচার, ব্যবস্থা—আমাদের কাছে অজ্ঞাত। অথচ এইগুলোই তাদের মনে প্রবেশের দরজা। যতটুকু আমরা অন্য প্রদেশের লোককে জানি, তা ঘটনাচক্রে মাত্র। ভারতের গঠনতন্ত্রে স্বীকৃত চৌদ্দটি ভাষার সাহিত্য আমাদের কাছে সম্পূর্ণ গ্রীক (নিজের মাতৃভাষা ছাড়া)। কিন্তু প্রতিদিন এই ভাষাগুলিতে আমাদের কোটি কোটি স্বদেশবাসীর মন মুখর হয়।

এ বিষয়ে বাংলাদেশের চিত্ত একটু উচকপালে। তার চোখ প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আড়ি করে বসে আছে। তার ভাব সাগরপারের দূর দেশের সঙ্গে। তাতে লাভ হয়েছে নিশ্চয়ই, সাগরপারের মণিমাণিক্য কিছু আমরা ঘরে তুলেছি। কিন্তু লোকসানও হয়েছে ; দেশকে আমরা কম চিনেছি। সে ক্ষতি সামান্য নয়।

বাংলা ভাষায় ভারতীয় অন্য ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রায় চোখেই পড়ে না। এ হেন সময় প্রায় চারশো পাতার একটি উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস দেখলে বিস্মিত ও আনন্দিত হতে হয়। লেখক—হরেন্দ্রচন্দ্র পাল। মুসলমানরা নানা কারণে একটু উর্দুপ্রেমিক হয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের অনেকের সময় কেটেছে কি করে বাংলার মধ্যে একটা আরবি শব্দ বসিয়ে দেব এই চিন্তায়। একটা মনীষা-সমৃদ্ধ বই লিখে বাঙ্গালীর সঙ্গে উর্দু সাহিত্যের পরিচয় ঘটাবার উদ্যোগ তাঁরা কেউ দেখান নি। এই বিশেষ কাজের জন্যই ডঃ পাল প্রশংসার্হ। তিনি কৃতবিদ্য ব্যক্তি। তিনি ফারসি

বাংলা ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের এম. এ. এবং রুমী সম্পর্কিত গবেষণা করে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট.। এই থীসিস্ কেম্ব্রিজের বিখ্যাত ইরানোলজিস্ট অধ্যাপক আরবেরীর অনুমোদিত। বাংলাতেও ডঃ পাল আগেই 'পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস' লিখে স্যার যদুনাথের মতো লোকের প্রশংসা পেয়েছেন এই ভাষায় : ডঃ পাল "একজন বিশেষজ্ঞরূপে প্রকৃত তথ্য দ্বারা বঙ্গভাষার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন।" এর পরে 'উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস' লিখে তিনি বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর অভাব দূর করলেন। বিশাল এই গ্রন্থে লেখকের পাণ্ডিত্যের ও রসবোধের পরিচয় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে সুন্দর ও প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতার উদ্ধৃতি থাকায় স্বল্পজ্ঞানী পাঠকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হবে। উর্দু সাহিত্যে একেবারে আদি যুগ থেকে প্রায় সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত লেখক এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। বিপুল পরিশ্রমের স্বাক্ষর গ্রন্থের সর্বত্র। লেখকের এই প্রয়াস সর্বপ্রথম পুরস্কৃত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা। এই পুস্তক প্রকাশে সরকার বিশেষভাবে অর্থানুকূল্য দেখিয়েছেন। ফলে খুব সুলভ মূল্যে গ্রন্থটি প্রাপ্য। সরকারের এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে যোগ্য লোকের ক্ষেত্রেই ঘটেছে।

বাঙ্গালী পাঠকদের উর্দু সাহিত্যের দিকে আকর্ষণ করবার জন্য অন্তত দুটি প্রলোভন সামনে উপস্থিত করা যায়।

প্রথমত, উর্দুভাষা কঠিন নয়। কেবল লিপির কথা বাদ দিলে আর্য-ভারতীয় বর্গের এ ভাষা প্রতিদিন হাটে-বাজারে শোনা হিন্দুস্থানী ভাষারই ঈষৎ মাজাঘষা রূপ।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যসম্পদের দিক থেকে বর্তমান ভারতে বাংলার পরেই বোধহয় আধুনিক উর্দু সাহিত্যের স্থান। সুতরাং কোনো সাহিত্যরসিক বাঙ্গালী পাঠকই ঠকবেন না।

এ বই পড়তে পড়তে বার বার সেই পুরাতন কথাটা মনে হয়েছে: সারা ভারতের জন্যে কি একটি লিপি প্রবর্তন সম্ভব নয়? তা সম্ভব হলে কোনো আঞ্চলিক সাহিত্যই আর অন্য কোনো অঞ্চলের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে থাকত না। ঐ সাধারণ লিপির পথেই বিভিন্ন অঞ্চলের মনের আনাগোনা চলত।

ইকবাল হোসেন

পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব, ১৯৬৪

১৯৬১ সালে কলকাতার সিনে ক্লাব পরিবেশিত প্রথম পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবে এই নতুন ঘরানার চলচ্চিত্ররীতি হঠাৎ আমাদের ধাক্কা দেয়। উৎসবের আগেই দেখা পাসেনডর্ফারের 'আন্‌সার টু ভায়োলেন্‌স্' এবং ওয়াইদার 'কানাল'-এর সঙ্গে এই নতুন ছবিগুলিকে মিলিয়ে দেখা মাত্রই পোলিশ সিনেমার স্বকীয় চরিত্রের একটা আভাস ধরা পড়ে। প্রথম দর্শনে এই ধারণা জন্মায় যে, বুদ্ধিনির্ভর চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে পোলিশ চিত্রনির্মাতারা চলচ্চিত্রের ভাষাকে সহজ রেখেও চিন্তাসঙ্কুল পথে বিচরণ করতে ভয় পান না। ওয়াইদা নিজেই বলেন, "চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমি এক-একটা সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে চাই, গুরুত্ববহ সমস্যা তুলে ধরতে চাই, এবং সেই সমস্যাকে দর্শকমণ্ডলীর কাছে সহজে পৌঁছে দেবার জন্যই আমার ছবিকে তার বিশেষ রূপ দিতে হয়।" এ প্রয়াসে ভয় থাকে; চলচ্চিত্রের ভাষার বৈশিষ্ট্যের শক্তিতে দর্শকমনকে চিন্তার বৃত্তে বাঁধতে না পারলে সে মনকে প্রশ্নবিশেষের জটিলতায় বাঁধা যায় না। কিন্তু পোলিশ পরিচালকদের কৃতিত্ব সেইখানেই। ধূসর মনোলোকের পটভূমি (কাওয়ালেরোভিচ্‌-এর 'নাইট ট্রেন'-এর থীম্‌-সঙ্‌, 'অ্যাশেজ্‌ অ্যাণ্ড্‌ ডায়োমণ্ড্‌'-এ শেষরাত্রের নাচ-গান, 'কানাল'-এ পাওলিকাউস্কি অভিনীত সুরকারের ইন্‌ফার্নো-যন্ত্রণার কথা মনে আসে) এবং মাঝে মাঝে নির্মমতার চাবুক ('কানাল' বা 'অ্যাশেজ্‌ অ্যাণ্ড্‌ ডায়োমণ্ড্‌'-এর শেষ দৃশ্য স্মরণীয়)—এই দুয়ের সতর্ক প্রয়োগে তাঁরা দর্শকের মনকে ভাবনার শৃংখলায় বেঁধে রাখতে পারেন।

সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা আয়োজিত এবারকার দ্বিতীয় পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবেও (নিউ এম্পায়ার, ১৪-২০ ফেব্রুয়ারি) দেখা গেল, বিগত মহাযুদ্ধই এখনও পোলিশ শিল্পীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গক্ষেত্র। অথচ এ প্রসঙ্গক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের অভাব নেই; পরিচালকেরা এই সব চিত্রে যুদ্ধের বহুবিচিত্র তাৎপর্যকেই প্রকাশ করেছেন। নিছক মৃত্যু, ধ্বংস বা জয়-পরাজয়েই যুদ্ধের অর্থ সীমিত নয়। ওয়াইদা এবং মুঙ্ক্‌ বারবার নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মহাসমরকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

এবারকার উৎসবে ওয়াইদার 'লোৎনা' (১৯৫৯) আধুনিক যুদ্ধে রোম্যান্টিক আর্তিকে স্থান দিয়েছে। সশস্ত্র ট্যাঙ্কের অমানুষিক অভিযানের

মুখে ঘোড়সওয়ারদের আক্রমণের মধ্যেই একটা ওল্ড ওয়র্ল্‌ড্‌ নস্ট্যালজিয়া ধরা পড়ে। শাদা ঘোড়াকে পাওয়ার সাধ এবং সেই স্বপ্নকে ঘিরে হিংসা, সন্দেহ এবং মৃত্যুর যে জাল রচিত হয়, তাতে গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবিদের স্বপ্নসাধের কথাই মনে আসে। দৃশ্যপরিকল্পনায়ও এই কবিদেরই কণ্ট্রাস্টের রীতি—প্রচণ্ড যুদ্ধের টালমাটাল তাণ্ডবের মধ্যেই 'কাট্‌' করে শাদা ফ্রেম—এবং সেই ফ্রেমের মধ্যে অন্য প্রান্ত থেকে প্রথমে ফ্ল্যাগস্টাফ এবং পরে ক্লোজ মিডিয়ম শটে আরোহীর প্রবেশ—তারপর ক্রমশ অপস্রয়মান লং শটে সমগ্র বাহিনীর আক্রমণ। ওয়াইদার রঙের ব্যবহার মূল তাৎপর্যে প্রবেশ করে। লাল রঙ, লাল আগুন, লাল ফুল, তামাটে পোশাকের মধ্যে শাদা ঘোড়া লোৎনা অন্য কোনো স্বপ্নের, অন্য কোনো জীবনের রূপকল্প হয়ে দাঁড়ায়। আতিশয্যবিহীন অথচ অর্থপূর্ণ দৃশ্যপরিকল্পনা ও রঙের সূক্ষ্ম কম্বিনেশন (লাল রঙ ও লাল চেরিফুল, শাদা ঘোড়ার পাশে ইভার শাদা পোশাক) ওয়াইদার ছবিতে এমন অর্থবহ হয়ে উঠেছে যে, ব্যক্তিগত অভিনয় এবং কাহিনীর টেন্‌শন এবারে গৌণ হয়ে গেছে। সেই কারণেই হয়তো 'লোৎনা'-র আবেদন 'কানাল' বা 'অ্যাশেজ্‌ অ্যাণ্ড্‌ ডায়োমণ্ড্‌'-এর মতো সহজ ও ব্যাপক হয় নি।

মুঙ্ক্‌-এর 'এরোইকা' (১৯৫৮) দুটি ভিন্ন কাহিনীতে আধুনিক যুদ্ধে ব্যক্তিগত শৌর্যের চরিত্রকে পরীক্ষা করেছে। একালে যুদ্ধ এমনই অ্যানাক্রনিজ্‌ম্‌ যে শৌর্যের চরিত্র পাল্টে গেছে। মদের বোতল হাতে দ্‌জিদ্‌জিউসের বীরত্বে মহত্ব নেই, চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই; বউয়ের ভয়ে লড়াই করতে যাওয়াতেও সেই একই কথা। শৌর্যে যেন একটা মাতলামি কিংবা নিতান্তই ইম্‌পাল্‌সের প্রাধান্য। অথচ এই শৌর্যকে শৌর্য বলে মানতে ভুল হয় না। একটি ঢিবির পাশে উত্তেজিত সৈনিক ও সিভিলিয়নদের ছুটোছুটি এবং গোলাগুলির মধ্যে দ্‌জিদ্‌জিউসের অটল স্থৈর্য; শেষে মদের বোতল চুরমার, অথচ তখনও সেই শান্তি—প্রচণ্ড তাণ্ডবের মধ্যে স্থৈর্য; তারপর বিপৎসঙ্কুল শান্তির মধ্যে স্থৈর্য—সশস্ত্র ট্যাঙ্কও প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। এই দুটি দৃশ্যে টেন্‌শনের তারতম্যে শৌর্যের বিচিত্র প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় কাহিনীতে শৌর্য মিথ্যা 'মিথ্‌'। একদিকে জাউইস্‌টাউস্কির কাহিনী, অন্যদিকে সময় কাটানোর দুঃসহ প্রচেষ্টা; একদিকে ইয়ার্ডের ছককাটা ভূমিতে সুরহীন তালহীন নৃত্যের গতিতে বন্দীদের পদচারণা;

অন্যদিকে ছাদের উপর বয়লারের রাশের মধ্যে একটি মানুষ বিরাট মিথ্যার উপর বেঁচে আছে। এই মিথ্যা যে মাত্র একজনের কাছে স্পষ্ট সেই জাক্-এর নিঃসঙ্গতার সঙ্গে জাউইস্টাউস্কির নিঃসঙ্গতার মিল আছে; মিথ্যাকে চোখ ঠেরে এরা বাঁচতে পারে না। তাই দুজনের মৃত্যুই আত্মহত্যা এবং পরস্পর-সম্পর্কিত। মুঙ্ক্ নিজেই বলেন, "আমার মতে, চিত্রনির্মাতার তাঁর কাজের শৈলী বা রচনারীতিতে মনঃসংযোগ করা অর্থহীন। তিনি তাঁর সমগ্র দৃষ্টি প্রয়োগ করবেন, দর্শকের সঙ্গে যে সমস্যা আলোচনা করতে চান, তারই উপর।" ঘটনা, দৃশ্য ও চরিত্রের সূক্ষ্ম ইণ্টার-রেলেশনের উপর মুঙ্ক্ তাঁর ছবিকে দাঁড় করিয়েছেন।

রোমান পোলান্স্কির বহু-আলোচিত 'নাইফ্ ইন্ দি ওয়াটার' (১৯৬২) এবারকার উৎসবে যুদ্ধের পরিবেশমুক্ত একমাত্র পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি। পোলান্স্কি সমগ্র পরিকল্পনায় প্রতীকতার উপর নির্ভর করেছেন। সংলাপের মাধ্যমেও প্রতীকের ভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংলাপে প্রায় কবিতার মতো এক-একটি অংশ অনাবৃত প্রকৃতি ও অনাবৃত দেহের সেন্সুয়স্ পরিবেশে জীবন, প্রেম ও বিবাহের তাৎপর্যকে ধরতে যায়। প্রতীকরচনায় পোলান্স্কির আদি উৎস ইয়োরোপীয় চেতনায় ভবঘুরের ইমেজ-এ, এবং সেই ইমেজ্‌কে কেন্দ্র করে সংসারের স্থির নিরাপত্তা ও প্রেমের বাধাবন্ধনহীন মুক্তির দোটানায় (সিঞ্জ্-এর 'দি শ্যাডো অফ্ দি গ্লেন' নাটকেরও উৎস এই চেতনায়)। রাস্তার মোড়ের অনিশ্চয়তায় কাহিনীকে শেষ করে পোলান্স্কি মিকোবরীয় আশাবাদের আশঙ্কা থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছেন। সময়ে সময়ে মানসিক সংঘাতকে শব্দের বিকৃত যান্ত্রিকতায় তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন (জলের শব্দ, নৌকোর শব্দ, পাখির কর্কশ ডাক)। গাড়ির সামনে অতর্কিত আবির্ভাব থেকেই যে সংঘাতের শুরু হয়ে গেছে, তাকে শান্ত অনড় আপাতস্বাভাবিক জীবনযাত্রার আড়ালে (ক্রিষ্টিন ও আন্দ্রেই-এর উদ্ধত আত্মনির্ভর অন্তরঙ্গতা— আন্দ্রেই স্ত্রীকে তেল মাখিয়ে দেয়; আন্দ্রেই ও ক্রিসের গুণগুণানি; কিংবা কাঠি নিয়ে সেই খেলা) লুকিয়ে যে টেন্শন্ রচিত হয়, সেই টেন্শন্ ক্রমশই তীক্ষ্ণ ও অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে, এবং সেই চাপা টেন্শন ছেলেটির জলে ডোবার অভিনয়ের মুহূর্তে বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। অতঃপর কাহিনীর প্রায় অবশ্যম্ভাবী গতি। টেন্শনের চরমবিন্দুর পরে আবশ্যিকতার স্থির গতিতে ক্রিষ্টিন ও ভবঘুরে ছেলেটির প্রেমে এমন একটা কম্পাল্শনের ভাব

আছে, যাতে তার অতৃপ্তি ও অর্থহীনতা গোপন থাকে না। চুম্বনের পরেই লেকের লং শট্ এবং তারপরেই দুজনের দুটি হাফ ক্লোজ-আপে অতৃপ্তির বিষাদের ছায়া আছে। লিঅন নিয়েমজিকের অভিনয়ে ('নাইট ট্রেনে'র ডাক্তারকে চিনতে কষ্ট হয় না) এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি হয় যার প্রতি সহানুভূতি অনুভব না করে পারা যায় না, যাকে দোষী সাব্যস্ত করতে মন চায় অথচ পারে না। অভিনয়ের শক্তিতে এই জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় পোলান্স্কি সমাজের টানাপোড়েনে ম্যারিওনেট্‌দের এই তিক্ত খেলার ইমেজ রচনা করতে পারেন।

উৎসবের বাকী ছবিগুলির মধ্যে 'বার্থ সার্টিফিকেট' ও 'প্যানিক্ ইন্ দি ট্রেনে'র মানবিকতা সহজেই স্পর্শ করে; প্রথমোক্ত ছবিটি মাঝে মাঝে অবশ্য সেন্টিমেণ্টালিটির ধার ঘেঁষে যায়। 'বার্নিং মাউণ্টেন'-এর দৈর্ঘ্য আক্ষেপের কারণ। অবশ্য মাঝে মাঝে ক্যামেরার চোখে চিত্রসদৃশ প্রাকৃতিক দৃশ্য ধরা পড়েছে।

গতবারের মতোই এবারও স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিগুলি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইয়ান লেনিকার 'ল্যাবিরিন্থ্' সুর্‌রিয়্যালিস্ট শিল্পীদের রীতিকে চলচ্চিত্রে প্রয়োগ করেছে। শহরের স্থাপত্যে ও পরিকল্পনায় দে শিরিকোর মেটাফিজিকাল ছবিগুলিকেই যেন দেখা যায়। এই রীতির ধারা অনুসরণ করে লেনিকা যুদ্ধাশ্রয়ী এই সভ্যতার বীভৎসাকে প্রকাশ করেছেন। ডাইমেন্শনকে ভেঙে এবং বস্তু ও প্রাণীর অবয়বকে ভেঙে মিশিয়ে ম্যাক্স্ আর্ন্স্ট্, গ্রোৎস বা মাগ্রিৎ-এর মতোই লেনিকা সুর্‌রিয়ালিজ্‌ম্-এর দুর্বোধ্য জগতে পৌঁছে গেছেন। ইয়ান লোমনিকির 'পোলিশ সুইট' মূলত টুরিস্ট ছবির পর্যায়ে পড়লেও শব্দ ও গতির তারতম্যে স্থানে স্থানে বিস্ময়কর সার্থকতা লাভ করে। গিয়েৎর্স্-এর 'দি লিট্ল্ ওয়েস্টার্ন' কার্টুন ছবির রূপের মধ্যে থেকেও অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মেজাজকে ধরেছে।

মাকারজিন্স্কির দুটি ছবিই স্বতন্ত্র আবেদনের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। আগের উৎসবে মধ্যযুগীয় ডান্স্ ম্যাক্যাব্র্-এর ফ্রেস্কো, বুখেন্‌ওয়াল্ডের কঙ্কালের সারি, মিউজিক হলের উদ্দাম নাচ-গান ইত্যাদি উপাদানের সুচিন্তিত সমাবেশ, গতির পরিবর্তন এবং শব্দের বৈচিত্র্যে রচিত 'লাইফ্ ইজ্ ওয়াণ্ডারফুল' দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এবারে জানলায় অপেক্ষমান মুখকে ঘিরে অর্থদ্যোতক কম্পোজিশনে এবং 'অ্যাটেনশন, আতাসিয়োঁ, আখ্‌তুঙ্' শব্দত্রয়ের মুহুর্মুহু

উচ্চারণে 'নাইট' ছবির নায়িকাকুলের মনোজগৎকে রচনা করেছেন। 'দি ম্যাজিশিয়ান' ছবিতে স্টাইলাইজেশন প্রায় বর্জন করেও অভিনয়ের উপর নির্ভর করে, গুলিবিদ্ধ পুতুলের ইমেজ-এ বৈনাশিক যুদ্ধের রূপকে প্রতিষ্ঠা করে মাকারজিন্স্কি একালের যুদ্ধের এক অর্থপূর্ণ রূপকল্প রচনা করেছেন। গিয়েৎর্স্ এবং পের্স্কির 'অ্যাওয়েটিং' রেস্তোর্াঁর টেবিলের উপর কাগজের ন্যাপ্‌কিন, অ্যাশ ট্রে, দেশলাইকাঠি, কফির কাপ, এবং একটি লাল ফুল—এই সামান্য উপাদানগুলির উপর নির্ভর করে অপেক্ষমান প্রেমিকের দুশ্চিন্তার নাটককে প্রতিফলিত করেছে। কাজিমিয়েৎর্স্ কারাবাজের 'মিউজিক মেকার্স' বিষয়ে ও আঙ্গিকে কোনোভাবেই অভিনবত্বের দাবী করতে পারে না; তবে পরিচালকের পরিমিতিবোধের এবং শব্দচেতনার প্রশংসা করতে হয়; বেসুর থেকে সুরে অতিক্রমণ ও হার্মনির রচনাই ছবির বিষয়বস্তু।

পরিশেষে, সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাব। উৎসব উপলক্ষে বিশেষ সদস্য গ্রহণের যে রীতি তাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাতে বিরাট দর্শকমণ্ডলী ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সহযোগী হবার সুযোগ পাচ্ছেন। সিনে ক্লাবের সদিচ্ছা সত্ত্বেও প্রথম পরীক্ষা হয়তো পুরোপুরি সফল হয় নি। 'এরোইকা' চলাকালে যাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন, সুইডিশ ছবি 'ফেস্'-এর মধ্যরাত্রে অ্যাটিকের ভাবগম্ভীর দৃশ্যে যাঁরা ইতর হাসি হেসেছেন, বিভিন্ন ছবি সম্পর্কে সু-উচ্চ কণ্ঠে উদ্ধত অর্বাচীন উক্তি করেছেন, তাঁরা চলচ্চিত্র উৎসবের সুস্থ আবহাওয়াকে নষ্ট করেছেন। সে-দোষ পুরোপুরি সংগঠকদের নয়।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লেখাপড়া

(সারা বিকেল দৌড়ঝাঁপ আর খেলাধুলো করে, সন্ধ্যেবেলায় পড়তে বসে তন্দ্রায় ঢোলা আর সামনে বই খুলে রেখে ঘুমে কাতর হয়ে পড়া—ছেলেবেলার এ অভিজ্ঞতা সর্বজনীন। সেই বয়সে আমরা কে-না ভেবেছি—ঘুমের মধ্যেই যদি পরদিনের ইস্কুলের পড়াটা হয়ে যেত, "হোমটাস্ক্"-এর অঙ্কগুলো সব আপনা আপনি কষা হয়ে যেত, তাহলে কি মজাটাই না হত!

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়াশোনা করা সত্যিই সম্ভব কিনা—এ প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞান আজ রীতিমতো মাথা ঘামাচ্ছে। এক্ষেত্রে যেসব গবেষণা চলেছে, তার ফলে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের এই নতুন শাখার নাম 'হিপ্‌নোপেডিক্স্'—যার বাংলা প্রতিশব্দ করা যেতে পারে 'নিদ্রানুশীলন'—অর্থাৎ, নিদ্রিতাবস্থায় পড়াশোনা করা। এই প্রবন্ধে নোভোস্তি প্রেস এজেন্সির বিজ্ঞান-ভাষ্যকার ভি. মিলাশেভিচ বিষয়টি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।)

আজকের দিনে 'যান্ত্রিক শিক্ষক', সাইবারনেটিক শিক্ষাদানের যন্ত্র আর 'ইলেক্ট্রোনিক টীচার'-এর এই যুগে, স্কুলঘরে ঘুমের মধ্যে কিংবা সংবেশনের (হিপ্‌নোসিস) অবস্থায় শিক্ষাদানের ধারণাটাই অনেকের কাছে হাস্যকর বলে মনে হবে। কিন্তু বহু বিজ্ঞানীর মতে, "হিপ্‌নোপেডিক্স্" অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে খুব কার্যকরী। মানসিক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে, নানা ধরনের বিমূর্ত ধারণার বিষয়ীকরণে এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে ও লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্ধারে 'নিদ্রা-চিকিৎসা'র এবং হিপ্‌নোটিক্স্ বা সংবেশনের কার্যকারিতা ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং এর ক্ষেত্রবিস্তার ঘটিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেও একে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা সম্ভব।

.৯৪০ সালে কারাগান্দা শহরের পাভলফ মনোবিজ্ঞান ইনষ্টিট্যুটের বিজ্ঞানী ডঃ এম. সিয়াদোশ্‌চ্ ইভান পাভলফের তত্ত্বকে কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করে ২০০ জন নরনারীকে নিয়ে পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা চালান। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল—ঘুমের মধ্যে বাক্-বোধের (স্পীচ পার্সেপ্‌শন) শারীরবৃত্তগত প্রক্রিয়া অনুধাবন করা। ডঃ সিয়াদোশ্‌চ্-এর এই গবেষণাকে

বলা যেতে পারে নিদ্রানুশীলন বা হিপ্‌নোপেডিক্‌স্‌-এর ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। তিনি এই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেসব তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেন, তার ফলে ওই দুশোজন নরনারীর বুদ্ধির মাত্রা, শব্দভাণ্ডার, প্রকাশক্ষমতা ও বিশ্লেষণক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার পক্ষে বিশেষ সহায়তা হয়। অবশ্য সিয়াদোশ্‌চ্‌ তখন ওই দুশো ব্যক্তির শুধু নিদ্রিতাবস্থাতেই তথ্য সংগ্রহ করেন—টেপ রেকর্ডার, এন্‌কেফালোগ্রাফ (মস্তিষ্কের তরঙ্গ লিপি), কার্ডিওগ্রাফ (হৃদ্‌পিণ্ডের তরঙ্গলিপি) ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে। তিনি তাদের ঘুমের মধ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করে, সেটা করেছিলেন তাদের সচেতন জাগ্রতাবস্থায়।

যুদ্ধের পর থেকে এ বিষয়ে বহু দেশেই বেশ ভালো রকম গবেষণার কাজ চলেছে। বর্তমানে হিপ্‌নোপেডিক্‌স্‌-এর অনুশীলনে দুটি প্রধান দিকের ওপরে জোর পড়ছে: স্বাভাবিক নিদ্রাকালে শিক্ষাদানের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা এবং সংবেশনের সাহায্যে ঘুম পাড়িয়ে সেই অবস্থায় শিক্ষাদানের পদ্ধতি।

একদিক থেকে, শিক্ষার্থীর নিদ্রিতাবস্থায় তাকে শিক্ষা দেওয়ার কাজটি সহজতর। কারণ, জাগ্রতাবস্থায় নিজের পরিবেশ সম্পর্কে সব সময়ে সচেতন থাকার ফলে তার মন বিক্ষিপ্ত হবার সুযোগও থাকে ঢের বেশি। সেই অবস্থায় শিক্ষকের প্রতি মনঃসংযোগ করার জন্যে তাকে বেশ কিছুটা মানসিক এনার্জি ব্যয় করতে হয়। নিদ্রিতাবস্থায় সেই চিত্তবিক্ষেপের কারণগুলি প্রায় থাকে না বললেই চলে। ঘুমের মধ্যে শিক্ষার্থীকে তাই কোনো পাঠ উপলব্ধি করার জন্যে ও স্মৃতিতে গেঁথে রাখার জন্যে ঢের কম প্রয়াস করতে হয় এবং অনেক কম মানসিক এনার্জি খরচ করতে হয়—যদি তার উপলব্ধির ক্ষমতাকে আর বোধশক্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করে তোলা যায়। দেখা গেছে, যাদের অনুভূতি, বোধশক্তি ও স্মৃতিশক্তি স্বভাবতই উন্নত তাদের ক্ষেত্রে নিদ্রানুশীলন যেমন কার্যকরী, ঠিক তেমনি যারা এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর তাদের ওই গুণগুলিকে বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারেও হিপ্‌নোপেডিক্‌স্‌ বেশ সুফলপ্রসূ। বিশেষ করে যখন কোনো কিছুকে স্মৃতিতে গেঁথে রাখা একান্ত দরকার, তখন হিপ্‌নোপেডিক্‌স্‌ খুবই কাজ দেয়।

ইতিমধ্যে, উক্রাইনের বিজ্ঞান আকাদমির ভাষাবিজ্ঞান ইনষ্টিট্যুটের বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে যেসব গবেষণা করেছেন, তার খুব উল্লেখযোগ্য ফলাফল জানা গেছে। এখানকার গবেষকরা প্রমাণ পেয়েছেন যে নিদ্রাবস্থায় যেসব

তথ্য মাথার মধ্যে "ঢুকিয়ে দেওয়া হয়", মানবমস্তিষ্ক তার শতকরা ৯২ থেকে ১০০টি তথ্যই ধারণ ও আত্তীকরণ করতে সমর্থ। মোট ৫০০টি ক্ষেত্রে পরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। একজন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র যেখানে ক্লাসে বসে পাঠ নিয়ে বছরে সবচেয়ে কমপক্ষে ২৫০টি বিদেশী শব্দ মনে করে রাখে, সেখানে সে সংবেশন দ্বারা হালকা ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থায় মাত্র ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার মধ্যেই ২০০ থেকে ৪০০ শব্দ স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও হিপ্‌নোপেডিক্‌স্‌-এর প্রয়োগফল খুব আশাজনক। রোগীর নিদ্রিতাবস্থায় মৌখিক ভাবে তার রোগ নিরাময়ের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে তাকে সারিয়ে তোলার পেছনে মূল নীতিটা হল রোগীর মনে এক স্থায়ী অকাট্য বিশ্বাস জন্মে দেওয়া—যাকে শারীর-মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে 'ডাইন্যামিক ষ্টিরিওটাইপ' সৃষ্টি করা।

হিপ্‌নোপেডিক্‌স্‌-এর প্রসঙ্গে আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার। মানুষের বিশেষ বিশেষ বয়সে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রকাশ পায় এবং লোপ পেয়ে যায়। সকলেই জানেন, পরিণত ও প্রবীণ বয়সে নতুন করে কোনো বিদেশী ভাষা শেখা তাই কষ্টসাধ্য। হিপ্‌নোপেডিক্‌স্‌-এর সাহায্যে এই বয়সের বাধা বেশ সহজে অতিক্রম করা যায়। উক্রাইনের ভাষাবিদ্যা ইনষ্টিট্যুট যাঁদের নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সব বয়সের লোকই ছিলেন।

বলা বাহুল্য, হিপ্‌নোপেডিক্‌স্‌ এখনও পর্যন্ত নিতান্ত নতুন একটি বিজ্ঞান এবং নতুন বলেই, অসংখ্য তথ্য সংগ্রহের ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনের অবকাশ আছে। অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাও তাই এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে গবেষণায় নেমেছেন।

ঢোকরা শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন

ঢোকরা শিল্পকলার যে প্রদর্শনীটি কিছুকাল আগে অনুষ্ঠিত হল কলকাতায় লোকসংস্কৃতির লুপ্তপ্রায় শিল্প-ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সার্থক উদাহরণরূপেই তাকে চিহ্নিত করা যায়। নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থার পূর্বাঞ্চলীয় নক্সা কেন্দ্রের অধিকর্তা শ্রীপ্রভাস সেন ঢোকরা শিল্পকলার নিদর্শনকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে, শিল্প এবং শিল্পীকে পুনরুজ্জীবিত করেই এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন।

বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এই ক্ষুদ্র শিল্পী-গোষ্ঠী স্মরণাতীতকাল থেকে যাযাবরের ন্যায় ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। বিশেষ করে বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের সীমান্ত অঞ্চলেই ঢোকরা শিল্পীদের কয়েকটি ছোট গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিককালে এরা যাযাবরী বৃত্তি বহুলাংশে বর্জন করে নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসের চেষ্টাও করছে। বর্তমানে বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের কাছাকাছি একটি জায়গায়, বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে, আসানসোলে এবং উড়িষ্যা-মেদিনীপুরের সীমান্ত অঞ্চলে এই অবহেলিত, নিঃস্ব শিল্পী-সম্প্রদায়ের বসতি দেখতে পাওয়া যাবে। বাঙলা দেশে এই ঢোকরা শিল্পীদের সংখ্যা সমস্ত পরিবার মিলে অর্ধশতের সীমানা অতিক্রম করবে কিনা সন্দেহ। বাঙলা দেশ ছাড়াও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতেও এই ঢোকরা শিল্পীদের কয়েকটি গোষ্ঠী এখনো টিঁকে আছে। ঢোকরা শিল্পীদের কাজের ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য হয়তো আছে কিন্তু এদের পদ্ধতি-প্রকরণ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অভিন্ন। এদের তাই বাঁকুড়া কিংবা আউশগ্রামের শিল্পী (বাঙলা দেশ), ময়ূরভঞ্জ (উড়িষ্যা), বস্তার (মধ্যপ্রদেশ) কিংবা দক্ষিণ ভারতের ঢোকরা শিল্পী নামে স্বচ্ছন্দে চিহ্নিত করা যায়।

ঢোকরা শিল্পীরা সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে যে-সব জিনিসের প্রয়োজন হয় মূলত সেই সব নিদর্শনই প্রস্তুত করে আসছেন। বংশ-পরম্পরায় এই ঐতিহ্যই এখনো পর্যন্ত অনুসৃত হচ্ছে। যে শিল্পবস্তুটি এঁরা গড়তে চান সে-সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেই তবে অগ্রসর হন। তাদের এই ধ্যান-তন্ময় শিল্পচেতনা সত্যি এক বিস্ময়ের বিষয়। এই সহজাত শিল্পচেতনা এবং তন্ময়তার সাহায্যে ঢোকরা শিল্পী তার ঈপ্সিত শিল্পবস্তুটির

আদল থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কিভাবে সেই বস্তুটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে হবে সে-সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা মনে মনে গড়ে নিতে পারেন।

ঢোকরা শিল্প-কর্ম প্রধানত ধাতব মূর্তিনির্মাণ পদ্ধতিরই এক বিশিষ্ট রূপ। অথচ ঢোকরা শিল্পীরা তাদের বিষয়বস্তু নির্মাণে কোনো ছাঁচের সাহায্য গ্রহণ করেন না। ঢোকরা শিল্পীরা প্রথমে এঁটেল মাটি আর তুঁষ মিশিয়ে সেই মাটির সাহায্যে ঈপ্সিত বস্তুর একটি কাঠামো গড়ে নেন। এই কাঠামোটিকে পরে দো-আঁশলা মাটির প্রলেপ দিয়ে মসৃণ করা হয়। তারপর তেল আর ধুনো জ্বালিয়ে, এক ধরনের পেস্ট প্রস্তুত করে, সেই পেস্টের তারের সাহায্যে যে বস্তুটি প্রস্তুত করা হবে তার নক্সা ধীরে ধীরে ঐ মাটির কাঠামোটির উপরে ঢোকরা-শিল্পী সযত্নে গড়ে তোলেন। এইভাবে মাটির কাঠামোটি তেল-ধুনোর পেস্টের তারে ঢেকে দেওয়ার পর গোবরমাটির প্রলেপে এবং তুঁষ-মাটি ও বালির আস্তরণে আচ্ছাদিত করে একটি বড় ছিদ্রপথ রাখা হয়। সাধারণত এই ছিদ্রটার মুখে পিতলের টুকরো ঢেলে গোটা বস্তুটাকে আগুনের উত্তাপে এমন ভাবে গরম করা হয় যাতে গলিত ধাতু ঐ ছিদ্রপথে প্রবেশ করে ধুনো বা মোমের তারকে ভস্মীভূত করে সেখানে নক্সা অনুযায়ী শিল্পরূপ সৃষ্টি করে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'Lost wax process'। এই সমগ্র পদ্ধতিটার সঙ্গে অন্যান্য ধাতুমূর্তি নির্মাণ-পদ্ধতির পার্থক্য সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করে ঢোকরা-শিল্পী প্রতিটি শিল্পবস্তুর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নির্মাণ-পদ্ধতির সঙ্গে এককভাবেই যুক্ত থাকেন।

এই শিল্পীগোষ্ঠী এবং এদের সৃষ্ট শিল্প-নিদর্শন বাঙলার লোক-সংস্কৃতির এক পরম সম্পদ। একদা এদের কারু-নৈপুণ্যের স্বীকৃতিদানেও বাঙলা দেশ কার্পণ্য করে নি। বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে এদের অপূর্ব সুন্দর শিল্প-কর্মের নিদর্শন এখনো সযত্নে সংরক্ষিত। বাঙলার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, এমনকি লৌকিক ক্রিয়া-কর্মেও এদের শিল্পকর্মের নিদর্শন বহুল পরিমাণে একদা ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক দেব-মন্দিরে কিংবা সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারে ঢোকরা কামারের তৈরি দেব-দেবীর মূর্তি, কারুকার্যখচিত পঞ্চ প্রদীপ, কাজললতা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি ইত্যাদি একটু লক্ষ্য করলেই দৃষ্টিগোচর হবে বলে আমার ধারণা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চাপে ঢোকরা শিল্পীদের শিল্পকর্ম অনাদৃত হতে হতে এমন পর্যায়ে পৌঁচেছিল যে, এই শিল্পী-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে। এমনকি স্বাধীনতার পরবর্তীযুগেও এইসব

শিল্পী-গোষ্ঠীর সঠিক অবস্থান সম্পর্কেও আমাদের কোনো সম্যক ধারণা নেই। শুনেছি, আসানসোলে যে কয়টি ঢোকরা শিল্পী পরিবার এখনো পর্যন্ত বেঁচে আছেন বহু চেষ্টা করেও হস্তশিল্প সংস্থার পূর্বাঞ্চলীয় নক্সা কেন্দ্রের অধিকর্তা শ্রীযুক্ত প্রভাস সেন তাদের সঙ্গে আজও কোনো যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন নি। এমনকি তাদের সঠিক অবস্থানও নাকি অজ্ঞাত। জনৈক ব্যবসায়ী তার ব্যবসার স্বার্থে এই শিল্পী পরিবারগুলিকে নাকি এখনো লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রেখে অবাধে শোষণ করে চলেছেন। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের এই ঘটনা থেকেই আমরা ঢোকরা শিল্পীদের সামগ্রিক অবস্থা সহজেই অনুমান করতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে, আউশগ্রাম, বাঁকুড়া কিংবা মেদিনীপুরের শিল্পী-গোষ্ঠীর দৈন্য-দশা বছর পাঁচেক আগেও ছিল বর্ণনাতীত। শ্রীযুক্ত প্রভাস সেনের কাছে শুনেছি, তিনি যখন এই শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন-মানসে বছর চারেক আগে আউশগ্রামের ঢোকরা পল্লীতে যান তখন গ্রামের প্রত্যন্ত প্রদেশে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত, অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত, ক্ষুধাতুর এই মানুষগুলি দেখে তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন নি এরা আবার তাদের লুপ্ত শিল্প-ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে। কিন্তু শ্রীযুক্ত সেনকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তিনি তাঁর নক্সা কেন্দ্রে দুজন ঢোকরা শিল্পীকে নিয়ে এসে সমগ্র আউশগ্রামের ঢোকরা শিল্পীদের মনে নতুন উৎসাহ সঞ্চার করে তাদের দিয়ে অসাধ্য সাধন করছেন। নক্সা কেন্দ্রের সরবরাহকৃত উপাদানে, উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিবেশে এইসব ঢোকরা শিল্পীরা যে সব আশ্চর্য শিল্পসম্ভার প্রস্তুত করেছেন মূলত তাই ছিল এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে দ্রষ্টব্য নিদর্শন। একটি লুপ্তপ্রায় শিল্প-ঐতিহ্যের এই পুনরুজ্জীবন নিঃসন্দেহে এক স্মরণীয় ঘটনা।

এই প্রদর্শনীর নিদর্শনের মধ্যে বাঙলার ঢোকরা শিল্পীর হাতে গড়া গণেশ, পঞ্চপ্রদীপ, সন্ধ্যামণি প্রদীপ, কৃষ্ণ, শিব, কৃষ্ণলীলা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি ইত্যাদির পাশাপাশি উড়িষ্যা ও বস্তারের ঢোকরা শিল্পীদের শিব-সুন্দরী, রাম, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেব-দেবীর অপূর্ব কারু-নৈপুণ্য আমাদের মুগ্ধ করেছে। লৌকিক শিল্প-চেতনার এমন বলিষ্ঠ স্বাক্ষর সত্যিই দুর্লভ। উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা পেলে বাঙলার অন্যান্য লুপ্তপ্রায় শিল্প-ঐতিহ্যকে যে পুনরুজ্জীবিত করা যায়, এই প্রদর্শনী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমাদের অন্ধ ভাগ্যবিধাতারা কি এ-পথে অগ্রসর হবেন ?

নিখিলেশ দাশের চিত্রকলা

সম্প্রতি পার্ক স্ট্রীটের আর্টিষ্ট্রি হাউসে তরুণ শিল্পী নিখিলেশ দাশের প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই প্রদর্শনীতে তেলরঙ ও জলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত তাঁর চুয়াল্লিশখানি চিত্র-নিদর্শন আমরা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। শিল্পী দাশ এই প্রদর্শনী উপলক্ষে এক ঘোষণায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করে লিখেছিলেন : "আমি মত্ততাকে আলিঙ্গন করতে চাই—মত্ততার মুক্ত রৌদ্রে অবগাহন করতে চাই,…বস্তুবাদিতা বা প্রত্যক্ষবাদিতার কোনো গভীর অর্থ নেই। মানুষের ভিতর যে চরমবস্তু আছে তারই সঙ্গে বোঝাপড়া করে আত্মসমর্পণ করতে হয়…" ইত্যাদি।

শিল্পী দাশের এই উপলব্ধি নিঃসন্দেহে তাঁর তারুণ্যেরই শুভ সূচনার স্মারক। এবং এ-কথাও ঠিক যে, বাঙলার তরুণ শিল্পীরা চিত্রবিদ্যার প্রথাগত রীতি পরিত্যাগ করে বিমূর্ত চিত্ররচনার দিকে যেভাবে ক্রমধাবমান তাতে শিল্পী দাশ তাঁর বক্তব্য এবং চিত্র রচনায় যদি সে-দিকে আকৃষ্ট হন তবে তাঁকে খুব বেশি দোষ দেওয়াও যায় না। প্রকৃতপক্ষে শিল্পী নিখিলেশ দাশ বিমূর্ততারই পূজারী। তাঁর প্রদর্শিত চিত্রে এই চেতনা স্পষ্টভাবেই বিধৃত। কিন্তু অবয়ব ভাঙতে গেলে অবয়ব গঠন সম্পর্কে যে দক্ষতার দরকার, বিমূর্ত শিল্প-চেতনায় অবগাহন করতে হলে মূর্ততার যে সম্যক ধারণার একান্ত প্রয়োজন তার আভাস কিন্তু শিল্পী দাশের চিত্রে সহজলভ্য নয়। তাঁর তেলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রের জমিন সৃষ্টি কিংবা নক্সা সাজানোর কাজে মুন্সিয়ানা থাকলেও সব মিলে চিত্র-বক্তব্য কিন্তু আমাদের তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি। অবশ্য তাঁর ১৬,২০, ও ২২ নং চিত্রের ভাঙ্গা অবয়ব সংস্থাপন মন্দ নয়। ১নং চিত্রের জমিন সৃষ্টিতেও শিল্পীর দক্ষতা প্রশংসনীয়। তেলরঙের চিত্রের তুলনায় শিল্পীর জলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রের কাজ তুলনামূলকভাবে ভালো। কারণ, জলরঙের কাজে তিনি অবয়বের কিঞ্চিৎ আভাস যেমন চিত্রপটে তুলে ধরেছেন তেমনি অনেকগুলি চিত্রে তাঁর বর্ণপ্রয়োগের কৌশলও দৃষ্টিসুখকর। জলরঙের চিত্রগুলির মধ্যে ২৪, ২৫, ৩১ ও ৩২ নং চিত্র আমাদের ভালো লেগেছে।

আশা করি তরুণ শিল্পী নিখিলেশ দাশ ভবিষ্যতে আমাদের আরও সুন্দর চিত্রকলা উপহার দেবেন।

ধনঞ্জয় দাশ

১৯৬৪ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া আইন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য শ্রীবিধুভূষণ মালিক নতুন একটি খসড়া আইন প্রণয়ন করেছেন। ১৯৫১ সালের এ্যাক্ট অনুযায়ী এগার বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়েছে। ফলে এই আইনের সুবিধা-অসুবিধা বিচার করবার যথেষ্ট সুযোগ শিক্ষানুরাগী জনসাধারণ পেয়েছেন। ১৯৫৩ সালের আইন অনুযায়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন পুনর্গঠিত হল তারপর বাংলাদেশের শিক্ষাজগতের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কলেজের সংখ্যা ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা স্ফীত হচ্ছে। সরকারী দাক্ষিণ্যের পরিমাণ ও মঞ্জুরী কমিশনের সাহায্য অনেকখানি বেড়েছে। কলেজের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও 'বহিরঙ্গ' (External) প্রার্থী হিসাবে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন পরীক্ষায় বসেছে, অনেকে পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা কিম্বা সার্টিফিকেট পেয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে দেখা গেছে নানা ধরনের অসঙ্গতি। অসংখ্য 'অথোরিটি', অসংখ্য বোর্ড ও কাউন্সিল, তারপর সিনেট, সিণ্ডিকেট, আকাডেমিক কাউন্সিল হয়ে আইনত সিদ্ধান্ত নিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে বেগ পেতে হয়েছে, দক্ষতার সঙ্গে ও দ্রুততালে কাজ করার পথে দেখা দিয়েছে নানা বাধা। ফলে নতুন আইনরচনার প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক ভাবেই উঠেছে।

শ্রীযুক্ত মালিক যে খসড়া আইনটি রচনা করেছেন সে আইনটির অন্তর্নিহিত নীতিগুলি তিনি ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের শিক্ষাব্রতীদের রিপোর্ট থেকে গ্রহণ করেছেন। সংক্ষেপে নীতিগুলি এই:

১। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষাজগতের নেতৃত্ব নিতে হবে, নতুন দায়দায়িত্ব, বিশেষত কলেজীয় স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার বিবিধ দায়িত্ব নিতে হবে।

২। ১৯৫১ সালের আইনের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি নতুন আইনের সাহায্যে ঢেলে সাজাতে হবে। এই পুনর্বিন্যস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে একদিকে নানা কর্তৃত্বের নানা বিধি-বিধানের গোলকধাঁধা থেকে যেমন নিষ্ক্রান্ত হতে হবে তেমনি বিভিন্ন স্তরে সহজ, সরল, সুস্পষ্ট বিধি-বিধানের সাহায্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে, ফাংশনাল গণতন্ত্র চালু করতে হবে।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এই ব্যবস্থায় নীতিনির্ধারক, উপদেষ্টা সংস্থা হিসাবে কাজ করবে, প্রয়োজনমতো সিণ্ডিকেটের ও অন্যান্য সংস্থার কার্যকলাপের পর্যালোচনা করবে কিন্তু কার্যকরী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে না।

৪। সিণ্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সংস্থা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনব্যবস্থার ভার সিণ্ডিকেটের উপর ন্যস্ত হবে।

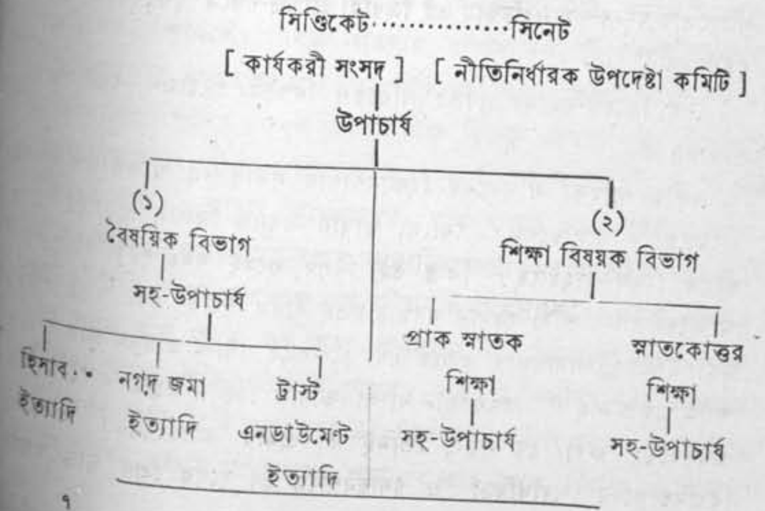
৫। আকাডেমিক কাউন্সিল শুধু শিক্ষাব্রতীদের নিয়ে গঠিত হবে এবং শিক্ষা বিষয়ে এই সংস্থার বক্তব্যই শেষ বক্তব্য হবে।

৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্বিন্যাসে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর রাজনীতির অবৈধ প্রভাব যেন না পড়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভূত কোনো সংস্থাও যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারায় হস্তক্ষেপ না করে।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারায় কলেজীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে, স্নাতকোত্তর ও প্রাক্-স্নাতক, এই দুই পর্যায়ের শিক্ষাকেই সম-মর্যাদা দিতে হবে।

এইসব নীতির উপর নির্ভর করে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মালিক যে খসড়া আইন রচনা করেছেন তার রূপরেখা এই প্রকারের:

১৯৬৪ সালের খসড়া আইন



আকাডেমিক কাউন্সিল

ফ্যাকাল্টিসমূহ

প্রাকস্নাতক কলেজ কাউন্সিল যথা কলা, বিজ্ঞান, কারিগরি, চিকিৎসা ইত্যাদি	স্নাতকোত্তর কলেজ কাউন্সিলসমূহ যথা কলা, বিজ্ঞান কারিগরি ইত্যাদি
বোর্ড অব স্টাডিজ্	বোর্ড অব স্টাডিজ্

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বাঙলাদেশ এ বছর আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করছে।

উনিশ শতকের রেনেসাঁস বা নব-জাগরণের পূর্ণ পরিবেশে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম, সে পূর্ণতার আভাস নিয়ে তিনি আমাদের মধ্যে এসেছিলেন। তাই, রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক কার্যকারণেই তিনি ছিলেন 'পরিপূর্ণ মানুষ'। তিনি ছিলেন—বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও সাহিত্যিক। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেছিলেন: "দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা—মানবচিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্র-সঙ্গমে যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছিল।"

সেই ত্রিবেণী-সঙ্গমের পূর্ণতর পরিচয়ও নিশ্চয়ই প্রয়োজন—সেই জন্য এই প্রস্তাব।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞানশাখার সভাপতির অভিভাষণে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন: "বাংলা ভাষার এখনও বিজ্ঞান প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে। কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। আমাদের বাংলা ভাষা বর্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র হউক এবং অপুষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞানবিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি।" তৎকালীন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-প্রচার ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধরচনা করা যে সম্ভব, তিনিই তা প্রমাণ করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে সে যুগের শ্রেষ্ঠ ছাত্র আচার্য

রামেন্দ্রসুন্দর শুধু অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই লেখেন নি, তাঁর লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের একই পঙক্তিতে ন্যায়সঙ্গতভাবেই স্থান পেয়েছে। তাঁর রচনায় আড়ষ্টতা নেই, দুর্বোধ্যতা নেই—সে লেখা হাস্যময়, কৌতুকময়, উচ্ছল উদ্বেল তার গতি। তাই, রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম-পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বলেছিলেন: "আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরসে চিরসঞ্চিত। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর,—হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।"

আচার্য রমেন্দ্রসুন্দরের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'প্রকৃতি'। তারপর 'জিজ্ঞাসা' 'কর্মকথা', 'চরিতকথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'শব্দকথা', 'বিচিত্র জগত', 'যজ্ঞকথা', 'নানাকথা', 'জগতকথা', 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

সরকারী চাকুরী নিলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, তাই রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজে অধ্যাপকের কাজ নিলেন। পরে অবশ্য অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে তিনি 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' পুস্তিকা লেখেন। তাতে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে একতাবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের হীন কৌশলকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করার জন্য বাঙলার মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। দেশপ্রেমিক রামেন্দ্রসুন্দর বাঙলা দেশকে হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমিরূপেই জেনেছিলেন। আজকের বিভক্ত বাঙলার সাম্প্রদায়িক বিরোধের বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরকে নতুন করে স্মরণ করা প্রয়োজন।

চিররুগ্ন রামেন্দ্রসুন্দর কখনও সংগ্রামে বিমুখ ছিলেন না। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে সংগ্রাম করার ক্ষমতারও সীমা আছে।

১৯১৯ সাল। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর মৃত্যুশয্যায়। ডায়ারের নেতৃত্বে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করে সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এলেন। শয্যার পাশে বসে তাঁকে এই খবর জানালেন। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করে অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ফলে তিনি তখন খুবই উত্তেজিত। এই উত্তেজনার রেশ কাটিয়ে উঠবার আগেই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন : "আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যার একটা বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল।"

জ্যোতির্ময় গুপ্ত

গ্যালিলিও স্মরণে

এ বছর পৃথিবীর দুজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে। একজন শেক্সপীয়র, অন্যজন গ্যালিলিও গ্যালিলি। ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান নায়ক গ্যালিলিও—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বপ্রধান অবদান পরীক্ষামূলক বিচারপদ্ধতি ও আঙ্কিক বিশ্লেষণের প্রবর্তন।

১৫৬৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ইটালীর পিসাতে গ্যালিলিওর জন্ম। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে গ্যালিলিও ধর্মশাস্ত্রে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিশেষ কাজ হয় নি। সঙ্গীত ও চিত্রকলা ছিল তাঁর খুবই প্রিয়। কিন্তু সে বৃত্তিও তার গ্রহণ করা হল না। ডাক্তারি পড়তে শুরু করলেন এরপর। এই সময়েই তাদের পরিবারের পরিচিত একজন অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকের কয়েকটি ক্লাসে যোগ দেবার সুযোগ তিনি পান। মুগ্ধ হলেন তিনি, শুরু হল মনের বিরাট পরিবর্তন। ডাক্তারি পড়ায় আনন্দ আর পান না, গণিতের অধ্যয়ন-বাসনাই প্রবল হয়ে উঠল। ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী ও গণিতবিদের জীবনের সূত্রপাত এভাবেই হয়েছিল।

গ্যালিলিও ক্রমে এ্যারিস্টটল, টলেমি ও অন্যান্যদের বস্তু ও প্রকৃতিজগৎ সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণার বিরোধী হয়ে উঠছিলেন। শুধু মনের ধারণাপ্রসূত বিজ্ঞানের যে তত্ত্ব, গ্যালিলিও তাকে গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। তাঁর মতে বাস্তব পরীক্ষা ও গাণিতিক যুক্তিকাঠিন্যই একটি তত্ত্বের সমর্থনের ভিত্তি বলে বিবেচিত হতে পারে।

পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে গ্যালিলিও পতনশীল বস্তুর সমস্যাদি নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। অ্যারিস্টটেলীয় মতে, বায়ুমণ্ডলে উড্ডয়নশীল একটি বস্তুর গতির মূলে রয়েছে, বস্তুটির ওপর বায়ুর ক্রমাগত চাপসৃষ্টি। গ্যালিলিও তাঁর পরীক্ষা শুরু করলেন এই ধারণার ভিত্তিতে যে একটি উড্ডয়নশীল বস্তু তার গতিসৃষ্টির সূচনা থেকেই চলবার বেগ লাভ করে থাকে। তিনি ভূমিতলের সঙ্গে বিভিন্ন গতি-বিশিষ্ট ঢালুক্ষেত্রের গা বেয়ে নানা ওজনের ছোট

ছোট গোলাকার বস্তুকে গড়িয়ে যেতে দিলেন ; তারপর তাদের সেই ঢালুতলের গা বেয়ে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দেখলেন কতটা উচ্চতায় তারা গিয়ে পৌছাচ্ছে। এখানে গ্যালিলিও পরীক্ষা করছিলেন সম্পূর্ণ একটি আধুনিক পদ্ধতিতে, যার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল এমনভাবে যাতে গাণিতিক পরীক্ষাকাজ চালানোর মতো যথেষ্ট সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়। গাণিতিক পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের প্রতি গ্যালিলিওর এই যে আকর্ষণ, তা তাঁর 'Il saggiatore' গ্রন্থের এক জায়গায় সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

"Philosophy is written in that vast book which stands forever open before our eyes, I mean the universe ; but it cannot be read until we have learnt the language and become familiar with the characters in which it is written. It is written in mathematical language, and the letters are triangles, circles and other geometrical figures, without which means it is humanly impossible to comprehend a single word."

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্যালিলিওর অবদান ছিল পূর্ববর্তী সমগ্র ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহ। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে দূরবীণ যন্ত্র আবিষ্কার হয় হল্যাণ্ডে। আট বছর বাদে গ্যালিলিও নিজের হাতে আরো উন্নত, সমৃদ্ধ রূপে যন্ত্রটিকে তৈরী করলেন। গ্যালিলিও ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ, যার দৃষ্টিতে দূরবীণের মাধ্যমে মহাকাশের বিরাট ঐশ্বর্য উদ্ভাসিত হল। সূর্যবক্ষে সৌরকলঙ্কের সন্ধান পেলেন তিনি ; মহাজাগতিক বস্তুর দেহেও পরিবর্তন সূচিত হতে পারে—গ্যালিলিওর এই আবিষ্কার ছিল মধ্যযুগীয় চার্চের প্রচারিত তত্ত্ববিরোধী। গ্যালিলিওর দূরবীণে ধরা পড়ল বৃহস্পতির চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান চারটি চাঁদের অস্তিত্ব। গঠনগত বিচারে পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদ ও শুক্রের অনেক মিল তিনি খুঁজে পেলেন—অ্যারিস্টটলের ধারণায় যা কোনোমতেই হওয়া উচিত নয়, যে-বিচারে প্রতিটি মহাজাগতিক বস্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে গড়া এবং পরিবর্তনহীন। বহু নতুন নক্ষত্রলোকেরও সন্ধান পেলেন গ্যালিলিও। তাঁর সমগ্র আবিষ্কার কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক জগতের যে ধারণা, তাকে আরো শক্তিশালী করে তুলল। ধর্মশাস্ত্রের বিরোধী মত প্রচারের জন্যে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিও অভিযুক্ত হলেন। এবারের মতো তিনি রেহাই পেলেন,

তবে কোপার্নিকাসের অনুকূলে যেন তিনি কোনো মত প্রকাশ না করেন সেভাবে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হল।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে Two principal systems নামে গ্যালিলিও একটি বই প্রকাশ করেন—যেখানে তিনটি চরিত্রের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে কোপার্নিকাস ও টলেমি, উভয়ের বিশ্ববিন্যাসের গুণাগুণ সম্বন্ধে যুক্তিবহুল আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। (গ্যালিলিও তাঁর সব বই ল্যাটিনের পরিবর্তে ইটালীয়ান ভাষায় লিখতেন, যাতে অনেক বেশি মানুষ সহজে তার বক্তব্য গ্রহণ করতে পারেন।) খুব কৌশলে কোপার্নিকাসের তত্ত্বকেই জয়যুক্ত করা হয়, যদিও তা ছিল খুবই প্রচ্ছন্ন। গ্যালিলিও আবার চার্চের কোপদৃষ্টিতে পড়লেন। বিরাট বিচার হল তাঁর। সে বিচার নিয়ে বহু কাহিনী রচিত হয়েছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গ্যালিলিও স্বগৃহে অন্তরীণ হয়ে থাকবার শাস্তি পেলেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোনো গবেষণা-কাজ তাঁর পক্ষে হল নিষিদ্ধ! তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ নিয়ে বহ্ন্যুৎসব করা হল।

অন্তরীণ অবস্থায় গ্যালিলিও গতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনের শেষ নয় বৎসর গ্যালিলিওর দুঃখকষ্টে কেটেছে। শেষ অবস্থায় তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ৮ই জানুয়ারী ১৬৪২ সালে ৭৭ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

শঙ্কর চক্রবর্তী

পরিচয় ভাদ্র (বিশেষ সমালোচনা) সংখ্যায় শ্রীসুকুমার মিত্রের লেখা "নাকার্গ দম্পতি" প্রবন্ধটিতে একটি মন্তব্য পড়ে আশ্চর্য হলাম। তিনি লিখেছেন য়ুগো ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক। জানিনা তিনি এই খবরটি কোথেকে সংগ্রহ করেছেন। যৌবনে রাজতন্ত্রের সমর্থক থাকলেও যৌবনোত্তর জীবনে তাঁকে আমরা গণতন্ত্রের স্বপক্ষেই সবসময়েই পেয়ে এসেছি। য়ুগোর সাহিত্যেও কোথাও রাজতন্ত্রের সমর্থন-সূচক কোনো কিছু পাওয়া যায় বলে আমার জানা নেই। অন্তত Les Miserables, Ninety-Three এবং কবিতাবলীতে নয়। ফরাসী রিপাবলিকের সমর্থক বলেই তাঁকে আমরা জানি। তা ছাড়া তাঁর সম্পর্কে অন্যান্য যেসব বই পড়েছি তাতেও শ্রীমিত্রের মন্তব্যের সমর্থনসূচক কিছু চোখে পড়ে নি আমার। Andre Maurios লিখিত Victor Hugo বইটিতে আমার বক্তব্যের সমর্থন মিলবে। 1848 সালে লুই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যে অভ্যুত্থান হয়েছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে Hugo-র চেহারাটা দেখা যাক :

> "He (Hugo) admitted that he had long hesitated before accepting the Republic but that then, seeing it 'treacherously seized, bound, pinioned and gagged', had fallen to his knees in front of it. 'Be careful, he was told, 'you will share its fate'—"All the more reason', he replied, "for my acting as I am doing ! Republicans, open your ranks and let me in ! I am one of you !"

এ ছাড়া আরও আছে—বাহুল্যবোধে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন বোধ করলাম না। এ-সম্পর্কে গর্কির Articles and Pamphlets-এর 'La Belle France' রচনাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা বোধহয় অযৌক্তিক হবে না। রচনাটি পড়ার পর য়ুগোকে রাজতন্ত্রের সমর্থক বলে কিছুতেই মনে করতে পারি না। যেভাবে জনগণের ফ্রান্সকে য়ুগোর ফ্রান্স বলে গর্কি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন তাতে য়ুগোকে গণতন্ত্রেরই বন্ধু বলে মনে হয়। একই সঙ্গে রাজতন্ত্রের সমর্থক এবং গণতন্ত্রের বন্ধু হওয়া যায় কিনা আমার জানা নেই।

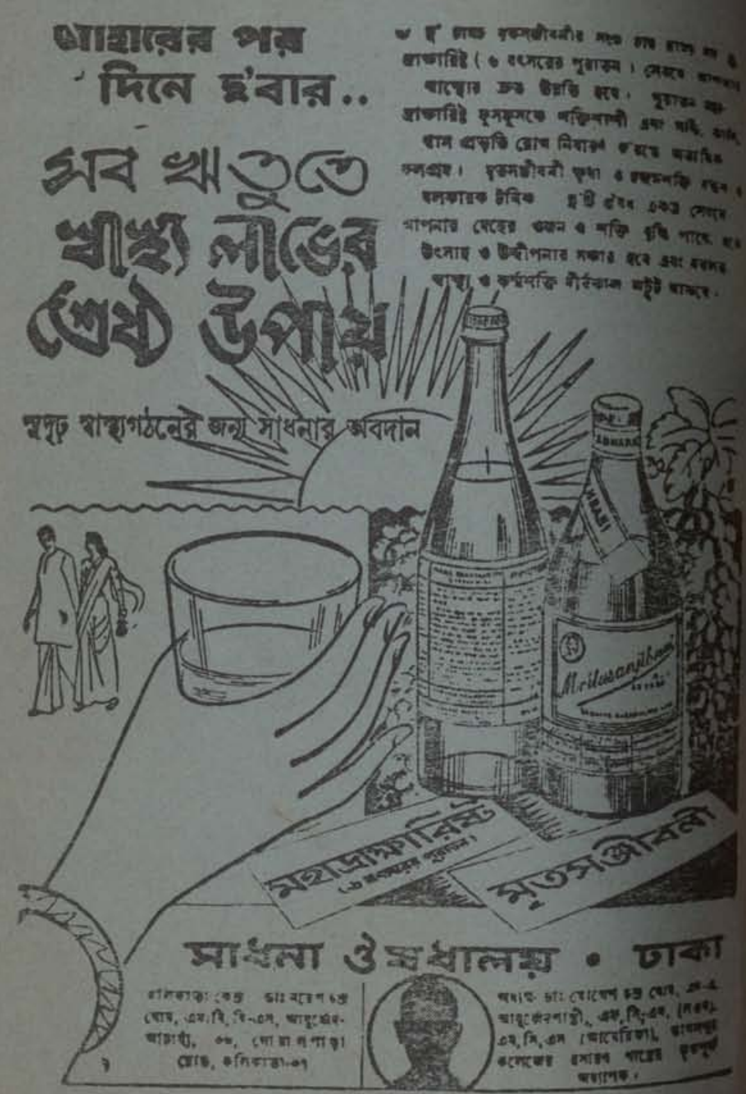
১৮৭১ সালে প্যারী কমিউনেও তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। এর সমর্থনে পণ্ডিত

নেহেরুর 'Glimpses of World History' থেকে উদ্ধৃতি দিলে বোধহয় আমার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হবে :

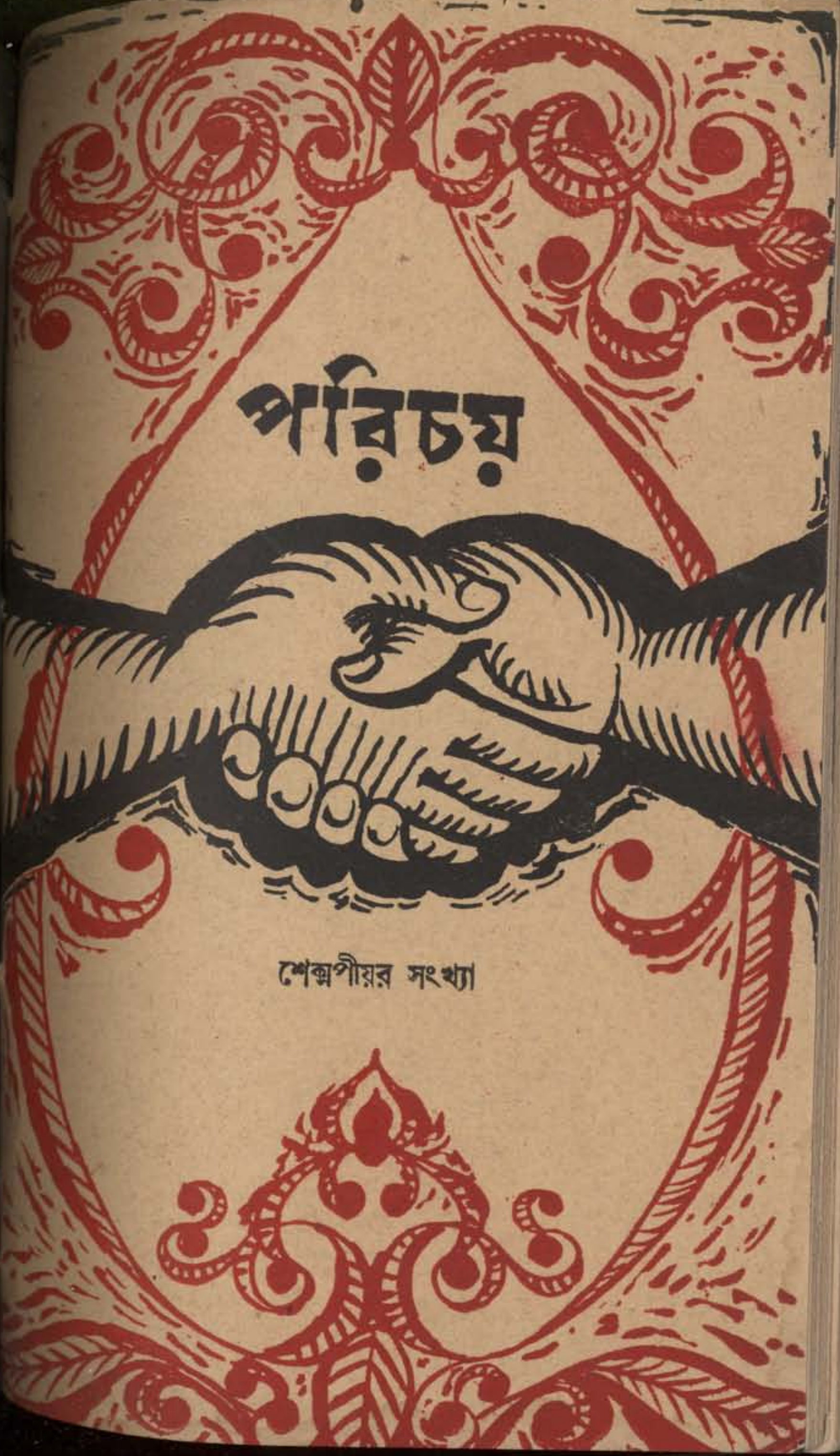
"He had a varied career both as a writer and as a politician. He started life as an aggressive royalist and almost a believer in autocracy. Gradually he changed step by step till he became a republican in 1848. Louis Napoleon, when he became president of the short-lived Republic, exiled him for his republican views. In 1871 Victor Hugo favoured the the Commune of Paris. From the extreme right of conservatism he had moved gradually but surely to the extreme left of socialism."

এর পরেও কি বিশ্বাস করতে হবে যে য়ুগো রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন? য়ুগো বুর্জোয়াদের (শুধুমাত্র বুর্জোয়া ?) প্রিয় ছিলেন বলেই পল লাফার্গের মত অনুযায়ী তাঁকে রাজতন্ত্রের সমর্থক হতেই হবে ? লাফার্গের য়ুগো সম্পর্কিত কয়েকটি বিদ্রূপাত্মক পত্রের ব্যাখ্যার জন্যে তাঁকে রাজতন্ত্রের সমর্থক হতে হল এটাই আশ্চর্য ! আর লাফার্গের ব্যাখ্যাই যে অভ্রান্ত তারই বা প্রমাণ কোথায়? তাই মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলে নস্যাৎ করে দেবার একই ভ্রান্ত নীতিতে এই ধারণার মূল অনুসন্ধান করতে হবে।

শ্রীকুমার সেন



আহারের পর দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়
সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা



পরিচয়
শেক্সপীয়র সংখ্যা